শালিকজোড় মৃত্যুরহস্য

গৌতম রায়

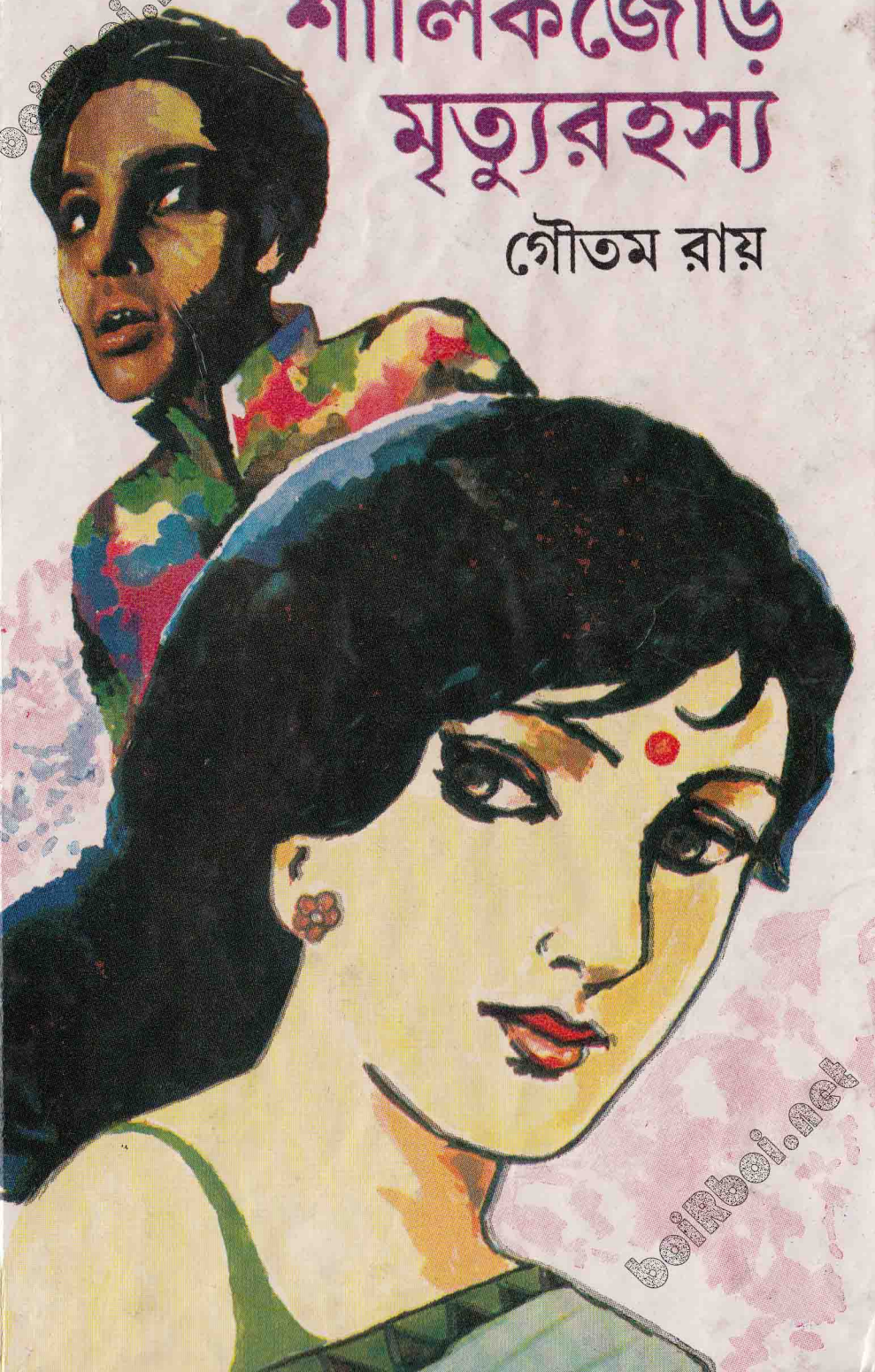

boiRboi.net

শালিকজোড় মৃত্যুরহস্য

গৌতম রায়

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ◆ কলকাতা-৭০০০০৯

BanglaBook.net

SALIKJOR MRITYURAHASYA
By GOUTAM RAY. RS. 60.00

Published by : Samir Kumar Nath
Nath Publishing
73, Mahatma Gandhi Road
Kolkata-700009

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৩
মাঘ ১৪০৯

প্রকাশক ঃ সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ গৌতম রায়

বর্ণস্থাপন ঃ সুবিন্যাস
২৭/৬, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ অন্নপূর্ণা এজেন্সী
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

ISBN : 81-8093-007-6

৬০ টাকা

মৌসুমি-কে

boiRboi.net

BanglaBook.org

লেখকের অন্যান্য বই

গ্রীক প্রেমকথা	
গ্রীক ট্র্যাজেডি	
ছোটদের ইলিয়াড	
ছোটদের ওডিসি	
প্রেমিকের মৃত্যু ...	রহস্য উপন্যাস
খুনটা হতে পারতো	,,
অশান্ত শান্তনীড়	,,
আয়তি নিরুদ্দেশ ...	,,
তখন রাত বারোটা	,,
পরগাছা	,,
আড়ালে অন্য খেলা	,,
ফুলে গন্ধ নেই	,,
নিখোঁজ নায়িকা	,,
ব্ল্যাকপ্রিন্স	,,
নির্মলেরা খুন হচ্ছে	,,
পঞ্চমপিতা	,,
রহস্য সপ্তক	,,
রত্নহার রহস্য	ছোটদের রহস্য
হীরের বুদ্ধ	,,
সোনার প্যাঁচা	,,
ভাঙাদুর্গ ভয়ঙ্কর	,,
কিশোর রহস্য (১)	,,
শ্রীমতী ভয়ংকরী	সামাজিক উপন্যাস
কনে বিভ্রাট	,,
পরমপ্রেমী	সামাজিক উপন্যাস
কাঞ্চন অভিলাষ	,,
প্রতিনিয়ত	,,
পাপ অপাপ	,,
মধুরেণ	নাটক
ছন্দপতন	,,
শ্রীমান নাবালক	,,
বউকথা কও	,,
রাজনিদ্রা	,,
নো প্রবলেম	,,
নাতজামাই	,,
রঙ্গব্যঙ্গ একাংক	সংকলন
একাংক ছয়রঙ্গ	,,
রবীন্দ্র-গল্পে ছোট নাটক	,,
ওলটপালট	একাংক
জুয়েলথীফ	,,
নির্ভিক সমিতি	,,
নিহত শতাব্দী	,,
সৎকার	,,
এই আমি	,,
অশোকার অসুখ ...	প্রমীলা একাংক
আঁধার সীমানায় ...	শ্রুতি
গোপনসত্য ...	রহস্য নাটক

শ্যামচাঁদ একটু রাত থাকতেই উঠে পড়ে। অনেকদিনের অভ্যেস। তা ছাড়া সকাল আটটার মধ্যে ওকে কারখানায় পৌঁছতে হয়। আটটা মানে আটটা। দেরি হলেই মালিক জনার্দন রেগে আগুন হয়ে যাবে। অবশ্য হাজিরার ব্যাপারে শ্যামচাঁদের কোন গাফিলতি নেই। প্রতিদিনের মতো সেদিনও উঠেছিল চারটে নাগাদ। প্রাতঃভ্রমণটা এখন ওর নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিল রেললাইনের ধারে ওলাইচণ্ডীর থান পর্যন্ত। ফিরতে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হোল। এখন গ্রীষ্মকাল, তবে মাঝে মাঝে মেঘের আনাগোনা চলছে। ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার ফিকে হচ্ছিল। হঠাৎই ওর মনে হোল লাইনের ওপর কিছু একটা পড়ে আছে। সাদা মতো কিছু। এমনটা হবার কথা নয়। কিছু একটা সন্দেহ করেই ও খানিকটা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যা সন্দেহ করেছিল বোধহয় তাই। কে যেন শুয়ে আছে লাইনের ওপর। দ্রুতপায়ে কাছাকাছি যেতেই ওর মাথাটা ঘুরে গেল। সাদা শার্ট, ছাই রঙা প্যান্ট, এক পায়ে চটি আছে। অন্যটা পা থেকে খসে গেছে। আর! শ্যামচাঁদের মনে হোল তার মাথা টলছে। কিছু একটা ধরতে না পারলে এখুনি পড়ে যাবে। লাইনের একদিকে ধড় অন্যদিকে মাথা। রক্তে সমস্ত জায়গাটা লাল হয়ে গেছে। টাটকা তাজা রক্ত।

শামচাঁদ বসে পড়েছিল। এমন বীভৎস দৃশ্য ও কোনদিন দেখেনি। প্রথম ঘোরটা কাটতে বুঝতে পারল ওর সারা শরীর কাঁপছে। আবছা আলো আর অন্ধকারে ও লোকটার মুখটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হোল না। মুখটা মাটিমুখো একপাশে কাত্ হয়ে আছে। কে, কী বৃত্তান্ত কিছুই বোঝার উপায় নেই। শ্যামচাঁদ এর আগে তাকে দেখেনি।

ছোটবেলায় শ্যামচাঁদ একবার দত্তবাড়ির পুজোয় পাঁঠাবলি দেখেছিল। ঐ একবারই। দেখার পরই শরীর জুড়ে কাঁপুনি আর রাতের বেলায় ধুম জ্বর। পারতপক্ষে তারপর আর কোনোদিনও ও পাঁঠাবলি দেখেনি। রাস্তার ধারে বসা মুরগিঅলার মুরগি প্যাঁচানোও দেখে না। যদিও ওর জীবনের একটা সময় কেটেছিল অশান্ত উদ্দীপনায়, কিন্তু সে জীবন তো অনেকদিনই চুকেবুকে গেছে।

সেই মুহূর্তে একরাশ ভয়ও ওর কাঁধে চেপে বসল। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়। আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর ভোরের আলোও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে।

টলতে টলতে রেললাইন ছেড়ে ও মাঠ ধরে ছুট্ লাগালো। থামল এসে পুকুরধারে। ঘাটের রানায় বসে খানিকটা হাঁফাল। তার পর পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করে দু তিনটে কাঠি নষ্ট করে বিড়ি ধরাল। কয়েকটা টান দেবার পর গোটা ব্যাপারটা গোড়া থেকে ভাবতে চাইল।

লোকটা ট্রেনে কাটা পড়েছে, কাটাই পড়েছে। নইলে ওভাবে ধড় আর মুণ্ডু আলাদা হতে পারে না। কিন্তু এখন তার কী কর্তব্য? একবার ভাবল এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। এমনিতে সে কারো সাতেপাঁচে থাকে না। তারওপর এই রকম একটা ট্রেনে কাটা পড়ার ব্যাপার। কোন না কোন সময়ে কারো নজরে পড়বেই। তারা বুঝবে নয়তো রেলপুলিস বুঝবে। কী দরকার এমন উটকো ঝামেলায় থাকার।

হাঁটতে বেরিয়ে ও দুটো জিনিস সঙ্গে নিয়ে নেয়। গামছা আর ছোলা ভিজনো। ফেরবার পথে ছোলায় ব্রেকফাস্ট আর বোসপুকুরের পুকুরে স্নানটা সারা। পুকুরে কয়েকটা ডুব দিয়ে ও সোজা বাড়ি চলে এলো। গলাকাটা লাশটা ভূতের মতো ওর ঘাড়ে চেপেছিল। বাড়িতে ফিরেও সেই অস্থির ভাব। আসলে ও ভরসা পাচ্ছিল না পুলিসের কাছে যাওয়ার। কারণ পুলিসকে ও যমের মতো ভয় করে। স্বপ্না এতোক্ষণে উঠে নিশ্চয়ই সংসারের কাজে লেগে গেছে। সকালের এই সময়টা স্বপ্নার কোনদিকে কোন হুঁশজ্ঞান থাকে না। সাতটার মধ্যে শ্যামচাঁদকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে যেতে হয়। তার মধ্যে খাওয়াদাওয়া মায় টিফিনটি পর্যন্ত। বাইরের খাবার শ্যামচাঁদের সহ্য হয় না। ফলে স্বপ্নার খাটনিই বাড়ে।

বাড়িতে ফিরে জামাকাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে শ্যামচাঁদ ভাবছিল স্বপ্নাকে একবার একা পাওয়ার দরকার ছিল। এই ধরনের উটকো বিপদের সময় ওর বুদ্ধি খেলে ভালো। শ্যামচাঁদকে অনেকবারই বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে স্বপ্না। জামাটা গায়ে চড়াতে চড়াতে ও একবার রান্নাঘরে উঁকি দিল। গরমকাল। স্বপ্না উনুনের তাপে গলছে। এই সময় এইসব ফ্যাঁকরা তোলার কোন মানেই হয় না ভেবে ও নীরবে চলেই আসছিল। কিন্তু স্বপ্নার বোধহয় পেছনেও একজোড়া চোখ থাকে। ও বলল,—তুমি কিছু বলবে? বেশি টাকার দরকার?

—নাহ্, তবে থাক, আমার কি দরকার মাথা খারাপ করার? ও কিছু নয়। তুমি রান্না কর।

স্বপ্না বুঝতে পারে শ্যামচাঁদের তাকে কিছু বিশেষ কথা বলার আছে। আর কোন বিশেষ কথা বলার থাকলেই ও ঠিক এখনকার ভঙ্গিতেই তার পিছনে এসে ঘুরঘুর করে।

তরকারির কড়ায় জল ঢেলে ঢাকনা চাপা দিয়ে চা ছেঁকে উঠে এলো। হাতে চায়ের পেয়ালাটা ধরাতে ধরাতে বলল,—উঁহু, মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার ভিতরে কিছু একটা তোলপাড় করছে। কি হয়েছে আমায় বল।

চায়ের কাপে দুটো চুমুক দিয়ে নার্ভটাকে একটু সতেজ করে ধীরে ধীরে সকালের ব্যাপারটা আনুপূর্বিক বলে গেল।

সব শুনে স্বপ্না কয়েক সেকেন্ড কিছু ভাবল, তারপর বলল,—চেনো নাকি লোকটাকে?

—না, তখন তো পুরো ফরসা হয়নি। তার ওপর ভয়ভয় করছিল। দেখেই চলে এসেছি। তাছাড়া মুখটা তো প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। কাত্ হওয়া রক্তাক্ত একটা মুণ্ডু।

—তোমাকে ওখানে আর কেউ দেখেছে?

—মনে হয় না কেউ দেখেছে, এখন কী করি বল তো?

—রেললাইনে গলা দেওয়া তো নতুন কোন ব্যাপার নয়। হয়তো লোকটার মনে দুখ্যু-টুখ্যু ছিল। আত্মহত্যা করেছে।

—এদিকটা আমি তেমন করে ভাবিনি। হোতে পারে প্লেন অ্যাকসিডেন্ট না হলে আত্মহত্যাও হোতে পারে।

—আসবার সময় তুমি একবার পুলিসকে জানিয়ে আসতে পারতে।

—সেটাই তো সমস্যা। পুলিস মানেই ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়া।

—তবে আর কি? তুমি কিছুই দেখোনি। সোজা খাওয়াদাওয়া করে যেমন প্রতিদিন কাজে যাও তেমনি চলে যাও। দিনের আলো বাড়লেই লোক জানাজানি হবে। লাশ তো আর চিরকাল ওখানে পড়ে থাকবে না।

—তুমি তাই বলছ? মানে তুমি হলে তাই করতে?

—আমি হলে কি করতুম সে কথা থাক। তুমি যেটা করতে পারবে আমি সেটাই বললুম।

শ্যামচঁদ গুম মেরে একটা টুলের ওপর বসল। বিড়ি ধরাল, স্বপ্না চলে গেল রান্নাঘরে। বিড়ি খেতে খেতে শ্যামচাঁদ ভাবছিল তার এই পলায়নী মনোবৃত্তি স্বপ্নার মনঃপূত হয়নি। আর মনঃপূত না হলেও ও কোন তর্কে যায় না। নীরবে স্থানত্যাগ করে। আজও তাই করল। শ্যামচাঁদকে খেতে দিয়ে স্বপ্না রোজই খাবার

BanglaBook.org

সময়টুকু সামনে বসে থাকে। আজও বসেছিল, তার মুখে তেমন কোন ভাবান্তর ছিল না। আর পাঁচটা দিনের মতোই সামনে বসে থাকে। বাঁ হাতে পাখার বাতাস করছিল। গতকাল রাত থেকে সিলিং ফ্যানটা অকেজো হয়ে গেছে।

—আচ্ছা স্বপ্না, খুনখারাবির ঘটনা নয়তো? আজকাল কিন্তু এসব খুব হচ্ছে।

—হতে পারে।

—তাহলে কি পুলিসে যাওয়া উচিত হবে?

—তোমার তো পুলিসে যাবার কথা না। তুমি সোজা স্টেশনে যাবে, ট্রেন ধরবে। কারখানায় পৌঁছবে। নাও তাড়াতাড়ি কর। নইলে সাতটা দশের গাড়ি ধরতে পারবে না।

—হ্যাঁ, সেই ভালো।

শ্যামচাঁদ আবার খাওয়ায় মন দিল। তারপর রোজকার নিয়মে ছোট্ট সাইড ব্যাগটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল।

দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেও অস্বস্তির চাবুকটা সমানে চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছিল। সৎ নাগরিক হিসেবে তার বোধহয় থানায় সংবাদটা জানানো উচিত ছিল। কিন্তু ভয় মানুষের সততায় চিড় ধরায়। সৎ নাগরিকের তখন ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা।

স্টেশন রোড ধরে খানিকটা গেলেই পুলিস ফাঁড়ি। পারতপক্ষে ও কোনদিনও ফাঁড়িতে যায়নি। সত্যিই যখন দরকার পড়তো তখনও যেতে হয়নি। এখন তো নয়ই। কিন্তু সামনে দিয়ে যেতে যেতে ওর মনে হোল, লোকটার বাড়িতে একটা খবর পৌঁছনো দরকার। সেটা একমাত্র পুলিসই দিতে পারে। তাছাড়া তার তো ভয় পাবার কিছু নেই। সে যা দেখেছে সেটাই বলবে। সেই মুহূর্তে স্বপ্নার মুখটা মনে পড়ল। ও হলে এতোক্ষণে এফ. আই. আর. করে আসতো। কারণ তাদের চার বছরের বিবাহিত জীবনে স্বপ্নাকে মনে হয়েছে সে খুব সাহসী এবং বুদ্ধিমতী মেয়ে। কে জানে হয়তো কিছুক্ষণ পর ও নিজেই পুলিসে রিপোর্ট করবে।

যাবে কি যাবে না করতে করতে শ্যামচাঁদ সত্যি সত্যিই থানায় ঢুকে পড়ল। থানা অফিসার সত্যশোভন মজুমদার একাই বসেছিলেন। হয়তো কোন ডায়েরির বয়ান দেখছিলেন। শ্যামচাঁদকে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে তার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে বললেন,—এতো ভোরে আবার কি ব্যাপার?

সামান্য আমতা আমতা করে শ্যামচাঁদ সকালের ঘটনাটা আগাগোড়া বলে দিল।

—রেল লাইনের ওপর লাশ? সেটা তো রেলপুলিসের ব্যাপার।

—আজ্ঞে স্যার আমি অতশত জানি না। আমার মনে হোল থানায় জানানো দরকার তাই।

—অত ভোরে ওখানে গিয়েছিলেন কেন?

—আজ্ঞে। আমার একটু মর্নিং ওয়াকের নেশা আছে। রোজই যাই। ঐ রেল লাইন পর্যন্ত।

—বুঝলুম, বডিটা কার সেরকম কিছু আন্দাজ করেছেন?

—না স্যার, তখন সবে আলো ফুটছে, দূর থেকে দেখেছি, কিছুই বোঝা যায়নি।

—তা এতোক্ষণ পর খবর দিতে এলেন কেন?

—সত্যি কথা বলতে কী পুলিসি হ্যাপায় আসার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। কিন্তু স্বপ্না,—

—কে স্বপ্না?

—আজ্ঞে আমার বউ। ও খুব ডাকাবুকো মেয়ে। মুখে কিছু না বললেও থানায় আমার জানানো উচিত ছিল এটাই জানিয়ে দিল হাবেভাবে। তাই কাজে যাবার আগে,—

—কোথায় কাজ করেন?

—কলকাতায়। একটা ছোটখাটো লেদের কারখানায়। তাহলে স্যার যাই, সাতটা দশের গাড়িটা ধরতে না পারলে লেট খেয়ে যাব। মালিক লোকটা বড় খিটির মিটির করে।

সত্যশোভন একবার আগাগোড়া শ্যামচাঁদকে পরখ করে নিয়ে বললেন,

—হেড কনস্টেবলের কাছে নিজের নাম ঠিকানা দিয়ে একটা এফ. আই. আর. করে যান।

—ঠিক আছে স্যার। তা স্যার, কোন বিপদে পড়ে যাব না তো?

—বিপদে পড়ার মতো কোন কাজ কি করেছেন?

—না স্যার।

—তাহলে আর ভয় কি। যা বললাম তাই করুন।

শ্যামচাঁদ চলে যাবার পর সত্যশোভন কিছু একটা ভাবলেন। তারপর টেবিল ঘণ্টিতে চাপড় দিয়ে ডাকলেন,—

—নিমাই...নিমাই...

BanglaBook.org

২

সত্যশোভন মজুমদার জনা দুয়েক কনস্টেবল নিয়ে যখন অকুস্থলে পৌঁছলেন তখন রোদ উঠে গেছে। কতিপয় উৎসাহী যুবক এবং বৃদ্ধের সমাগম ঘটে গেছে। কেউ আবার এদিক ওদিক থেকে অতি বিজ্ঞের মতো দেহটি দেখছিল, পুলিস দেখে দু একজন একপা একপা করে সরে গেল।

সত্যশোভন মনে মনে হাসলেন। এরই নাম পাবলিক। দূর থেকে মজা দেখতে সবাই উৎসাহী। কিন্তু ঘটনার কাছাকাছি যেতেও তাদের পা সরে না। এর জন্যে সাধারণ মানুষকে সত্যশোভন হেয় চোখে দেখেন না। আত্মসর্বস্ব প্রতিটি মানুষই উত্তাপ নিজের কাঁধে নিতে চায় না। তিনি নিজেও জানেন, পুলিসি জেরা আর টানাপোড়েনে সাধারণ মানুষ তাদের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতেই চায়।

সত্যশোভন মৃতদেহটির কাছে এগিয়ে যান। কনস্টেবল দুজন পাশে এসে দাঁড়ায়। মৃতদেহটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে করতে তাঁর মনে হোল, লোকটির বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশি হবে না। চেহারা দেখে মনে হয় ভদ্রঘরের ছেলে। দেহটি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গলা থেকে মাথাটা ছিটকে গেছে কিছুটা দূরে। একপাশে কাত্ হয়ে আছে। চশমাটা চোখেই আটকে আছে। রক্তাক্ত। সাদা জামাও রক্তে চোবানো। হাত দুটো দুপাশে ছড়ানো, ডান হাতে খান তিনেক আংটি। পাথর বসানো। একটা মুক্তো, একটা গোমেদ একটা পলা। বাঁ হাতে রিস্টওয়াচ। ঘড়িটা তখনও চলছে। একটু ঝুঁকে, দেখলেন, টাইটান কোয়ার্জ।

কনস্টেবল নিমাই বলল, —স্যার বডিটা একবার উল্টে দেখলে হতো না।

—জি. আর. পি. তো দেখবেই।

—সে তো দেখবেই। তবে শেষপর্যন্ত কেসটা তো আমাদের কাছেই আসবে। তাই দরকারি জিনিস যতটা দেখে নেওয়া যায়।

—ওয়েল। গ্লাভস এনেছ তো?

—হ্যাঁ স্যার।

—ঠিক আছে, তুমি আর সনৎ বডিটা ওল্টাও। মাথাটাও।

ওরা তাই করল, মুখের ওপর ইতিমধ্যেই মাছি বসতে শুরু করে দিয়েছে। মুখটা প্রায় থেঁৎলে গেছে। রগের পাশটা বেশিরকম চোট খেয়েছে। সারা মুখে চাপচাপ রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। মাথা ছেড়ে সত্যশোভন দেহ নিয়ে পড়লেন। বুকপকেটে একটা পেন আটকানো আছে।

পকেটে কিছু কাগজপত্রও আছে। সেগুলো দেখার আগে যে কয়েকজন লোক ছিল তাদের উদ্দেশে অফিসার বললেন,—আপনারা তো এখানেই থাকেন?

একজন বয়স্ক ভারী গোছের মানুষ এগিয়ে এসে বললেন,—হ্যাঁ স্যার।

—কেউ কি চিনতে পারছেন একে?

প্রত্যেকেই না জানাল। ওরই মধ্যে বছর বারো-তেরোর একটি ছেলে সম্ভবত বাজারে আনাজটানাজ নিয়ে বসে, বলল,—মুখটা তেমন স্পষ্ট চেনা যাচ্ছেনি। তবে খানিকটা যেন আঁচ পাওয়া যায়। ফি রোববার বাবুটা আমার দোকানে আসতো।

—তাহলে চিনতে পারছো? থাকে কোথায়?

—তা তো বলতে পারবনি বাবু। সপ্তাহে একদিন আসতেন। অনেক আনাজটানাজ কিনতেন দরদাম করতেন নি। তাই মুখটা এট্টু এট্টু চিনতে পারছি। কিন্তু বাড়িতো চিনি না।

অতঃপর সত্যশোভন গ্লাভস পরা সত্ত্বেও খুব আলতো করে বুকপকেট থেকে কিছু কাগজ বার করে আনলেন। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। তদুপরি রক্তে জ্যাবজেবে হয়ে সেগুলো কিছুই পড়া যাচ্ছিল না। পেনটা বার করে আনলেন। জাপানি জেল পেন। ব্ল্যাক কালি। বেশ কিছুদিন ব্যবহার করার জন্যে কালি শেষের দিকে। পকেট থেকে ছোট নোটবই বার করে পাওয়া জিনিসগুলোর একটা লিস্ট করে নিলেন। তার পর গেলেন প্যান্টের পকেটে। রুমাল, ট্রেনের একটা মাস্থলি। শিয়ালদহ পর্যন্ত। পেলেন মনিব্যাগ। নাম ঠিকানা সেখানেই পাওয়া গেল। ভদ্রলোকের নাম রজতশীর্ষ নন্দী। থাকেন স্টেশন রোডের কাছাকাছি নতুন হাউজিং স্কীমে তৈরি হওয়া একটা ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটের নাম 'আশ্রয় আবাসন'। ফ্ল্যাট নাম্বার সিক্স। পাওয়া গেল একটা ভিজিটিং কার্ড। ভদ্রলোক বড়বাজার স্টেটব্যাঙ্কের একজিকিউটিভ র‍্যাঙ্কে রয়েছেন। কার্ডে বাড়ির ফোন নাম্বারও পাওয়া গেল। ডেডবডির ডিটেলস লিস্ট তৈরি করে পকেটে ভরলেন।

সত্যশোভনের মুখে হাল্কাহাসি ফিরে এলো। কনস্টেবল নিমাইয়ের দিকে ফিরে বললেন,—একটা আইডেন্টিটি পাওয়া গেল। এক কাজ কর। তোমরা এখানে থাক। আমি থানায় গিয়ে জি আর পি-কে ইনফর্ম করে দিচ্ছি। ঘটনাটা তো ওদের এক্তিয়ারে। ওরা প্রাথমিক কাজগুলো করুক। হঠাৎ সনৎ বলে ওঠে, —মনিব্যাগে কোন টাকাকড়ি পেলেন নাকি?

—হ্যাঁ দেখছি, বলে সত্যশোভন ব্যাগের পরের খাপটা খুললেন। নোটগুলো গুনতে গিয়ে ভ্রূ কোঁচকালেন, তারপর বললেন,— বাবা, এ তো দেখছি অনেক

টাকা। ছ হাজার ছশো টাকা প্লাস কিছু খুচরো। রাতবিরেতে পকেটে এতো টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, বলে ব্যাগটা মৃতদেহের পকেটে চালান করে দিলেন।

—আপনার কি স্যার মনে হয় এটা সুইসাইড কেস?

—কী করে বলব বল? পকেটে এতো টাকা নিয়ে কেউ সুইসাইড করতে যায়? তার ওপর সুইসাইড যদি করবে তাহলে নিশ্চয়ই ট্রেনের সামনে ঝাঁপটাঁপ দেবে। কিন্তু সে সব কিছুই হয়নি। বডিতে তেমন কোন চোটও নেই। সেটাই তো চিন্তায় ফেলেছে।

—হ্যাঁ স্যার, একমাত্র মুখটা ফুলে থেঁৎলে ড্রিসট্রটেড হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু হয়নি। আচ্ছা স্যার, এমনও তো হতে পারে কেউ ওকে আগে থেকে খুনটুন করে লাইনে শুইয়ে রেখে গেছে।

—পারে, সবই হতে পারে। কিছুই অবাস্তব নয়। লক্ষ্য করে দেখছ কিনা জানি না মাথার পেছনটা রক্তে জবজব করছে। জি. আর. পির পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না পেলে কিছুই বলা যাবে না।

—বাড়িতে একটা খোঁজ করা তো দরকার।

—আমি থানায় ফিরে সেই ব্যবস্থাই তো করছি। অবশ্য জি. আর. পি. কত কুইক অ্যাকশন নেয় সেটাই দেখ। তবে বডি ফেলে রেখে তোমরা কোথাও যেও না। আচ্ছা লাস্ট মেলট্রেন বা ফার্স্ট লোকাল এখান থেকে কখন পাশ করেছে, প্রশ্নটা করলেন জনতার উদ্দেশ্যে।

সবাই নীরব, প্রত্যেকেই ঘাড় নেড়ে তাদের 'না' জানিয়ে দেয়। আসলে এর বেশি কোন ভাবেই জনতা সক্রিয় হতে চায় না। এটাই স্বাভাবিক। আর কিছু না বলে সত্যশোভন থানার দিকে রওনা হলেন।

৩

ফোনটা বেজে বেজে একসময় রিংটা কেটে গেল। এস. আই. জগৎপ্রিয় কর রিসিভার ক্রেডেলে রাখতে রাখতে বলল, —স্যার, নো রিপ্লাই। হয় ফোন খারাপ নয়তো ওনার কেউ নেই।

—তাহলে কাউকে পাঠিয়ে দাও। অ্যাটলিস্ট আত্মীয়স্বজনের কাছে খবরটা পৌঁছনো দরকার।

—দেরি না করে এখনই গেলে হোত। আপনার না গেলেও চলবে স্যার। আমি একাই ঘুরে আসছি। জি. আর. পির পি. এম. রিপোর্ট কবে আসে দেখুন।

সত্যশোভন সিগারেট ধরাতে ধরাতে হঠাৎ জগৎপ্রিয়র দিকে একবার তাকালেন। কিছু একটা ভেবে বললেন,—ব্যাপারটা আমার একটু আজব লাগছে।

—কেন স্যার?

—পরে বলব। তুমি আগে ঘুরে এসো। ফ্ল্যাটে যেই থাকুন না কেন তাকে থানায় ডেকে নিয়ে আসবে।

—আপনার কি মনে হয় এটা সুইসাউড কেস?

—এভাবে কিছু বলা যায়? আজকাল কতরকম ভাবে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে সেটা কি জানো না?

—তা বটে। ঠিক আছে স্যার আমি ঘুরেই আসি।

—সনৎ আর নিমাই তো এখনও ফিরল না। তার মানে জি. আর. পির লোক এখনো আসেনি। বডি বেশিক্ষণ এভাবে ফেলে রাখা যায় না। এর পরই হয়তো অবরোধ শুরু হয়ে যাবে। যে কোন পার্টি সুযোগ নিয়ে নেবে। ও নাকি তাদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিল। তারপরই থানা অবরোধ, শালা দেশটা ক্রমশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। আর আমরা ধর্মের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। করার কিছু নেই। কিছু অ্যাকশন নিতে গেলেই, চুলোয় যাক, তুমি ঘুরে এসো, আমি দেখি বডি মর্গে পৌঁছল কিনা।

জগৎপ্রিয় বেরিয়ে যাওয়ার পর সত্যশোভন আর বসে থাকতে পারলেন না। ফাঁকিবাজিটা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। একে তো লোক মুখিয়ে আছে পুলিসের হাজারটা দোষ ধরার জন্যে। পান থেকে চুন খসলেই হোল। যেন পুলিস মানুষ নয়। অতিকায় কোন জীব। শালা ঘুপচুপ করে কে কাকে কখন কুপিয়ে দিচ্ছে, কার সঙ্গে কার শত্রুতা বাড়ছে, এর ওপর আছে রাজনীতির দাদারা। আছে তাদের মাস্‌ল্‌পাওয়ার। যত সব লুচ্চা বদমায়েসগুলোকে পুষছে নিজেদের স্বার্থে। আর সেই সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে পুলিসকে। কী দেশ মাইরি!

মাঝে মাঝে সত্যশোভনের মনে হয় পুলিসের চাকরি ছেড়ে দেবেন। এই পুলিসের চাকরি করতে গিয়ে গৃহে অশান্তি। স্ত্রী সুদেষ্ণা তো আজকাল তেমন ভালো করে কথাবার্তাই বলে না। একমাত্র মেয়ে প্রকৃতি, সেও তার বাবাকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। আসলে ডিউটি করতে করতে কবে থেকে যে গৃহ অসন্তোষ শুরু হয়ে গেছে সেটা তিনি নিজেও টের পাননি। যখন পেলেন তখন দেখেলেন সামাজিক সম্পর্কে অনেক ফাঁক তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু চাকরিটা

BanglaBook.org

ছেড়ে করবেনেই বা কি? বাপের কোন তালুক নেই যে বসে বসে রাজার হালে দিন কাটাবেন।

'দ্যুর ছাই, আর ভাল্লাগে না' বলে সত্যশোভন উঠে পড়লেন। ইদানীং শরীরটাও একটু থলথলে হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে বয়েসটা পঞ্চাশের ওদিকে চলে এল। আর কটা বছর কাটাতে পারলেই, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে সুদেষ্ণাকে নিয়ে এই সব জটিল আবর্ত থেকে বেরিয়ে যাবেন। একা থাকলে অনেকদিনই তাঁর মনে এই সব বেদনাপ্রসূত ভাবনা ছেঁকে ধরে। এই সমাজে ডাক্তার, উকিল, আর পুলিস তিনজনেরই এক হাল। উঠতে বসতে জনগণের সন্দেহ আর ঘৃণ্য দৃষ্টির শিকার হোতে হয়?

—স্যার।

ভাবনাচ্যুত হয়ে ঘুরে তাকালেন সত্যশোভন। নিমাই আর সনৎ ফিরে এসেছে।

—এসো। আমি তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। জি. আর. পি. বডি রিমুভ করেছে?

—হ্যাঁ স্যার, নিমাই উত্তর দিল।

—ওদের থেকে কোন অফিসার এসেছিল?

—স্যার, তেমন তো মনে হোল না, ওরা কেবল ডিউটি করল। এলো দেখলো, একটা সিজারলিস্ট বানাল তারপর ডোমেরা বডি নিয়ে চলে গেল।

—ঠিক আছে। তা নয় হোল, চেয়ারে গুছিয়ে বসতে বসতে সত্যশোভন বললেন,—লোকাল পিপ্‌ল কিছু ঝামেলা করেনি তো?

—এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। হয়তো খবরটা তেমন করে ছড়ায়নি। তবে ছড়াতে কতক্ষণ! দেখুন এই নিয়ে কেউ আবার লহর পাকাচ্ছে কিনা।

—পাকাতে পারে। প্রত্যেকেই তো ধান্দা আর মতলবে ঘোরে। সুযোগ পেলে লোকে সেটা হাতছাড়া করবে কেন? কিন্তু আমি ভাবছি, কেসটা কি হোতে পারে? মামুলি আত্মহত্যা? কিন্তু আত্মহত্যা হোলে নিদেন পক্ষে একটা নোটও যদি রেখে যেতো!

— স্যার, সনৎ বলল, এমনও তো হোতে পারে লোকটা মরতে যাবার আগে নোটটা বাড়িতে রেখে গেছে।

—সে সম্ভাবনা যে নেই তা বলছি না, কিন্তু বাড়ির ফোন তো নো-রিপ্লাই হচ্ছে। জগৎপ্রিয়কে পাঠিয়েছি। দেখা যাক।

দেখার আগেই রিনরিনিয়ে ফোনটা বেজে উঠল। ইলেকট্রনিক্সের দৌলতে হেঁড়ে গলার ফোনগুলোর আওয়াজ মিহি হয়েছে। মেয়েলি হয়েছে। সত্যশোভন ফোন তুললেন। ওপাশ থেকে জগৎপ্রিয় মোবাইলে কথা বলছে,—স্যার, আপনাকে একবার আসতে হচ্ছে।

—কেন? এনি প্রবলেম?

—প্রবলেম মানে, দরজায় তো তালা। ডবল লক। আশপাশের লোকও তেমন কিছু বলতে পারছে না।

—ঠিক আছে তুমি ওখানেই থাক। আমি আসছি।

কালবিলম্ব না করে সত্যশোভন জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

৪

আর পাঁচটা মডার্ন সিস্টেম ফ্ল্যাট বাড়ির মতোই 'আশ্রয় আবাসন'। পাঁচতলা বাড়ি। বাড়িটাকে দুদিকে ফালা করে সিঁড়ি উঠে গেছে। দুপাশে পাঁচ-পাঁচ দশটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসগৃহ। রজতশীর্ষ থাকে তিনতলায়। ফ্ল্যাট নম্বর ছয়। তিনতলায় সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়েছিল জগৎপ্রিয়। তার মুখে কিছু উদ্বেগ। ছ নম্বরের সামনেই পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট। ভেতর থেকে বন্ধ। স্বাভাবিক। পুলিসের পোশাকে জগৎপ্রিয়কে দেখে কেউই আর নাক গলায়নি। সত্যশোভন দেখলেন ফ্ল্যাটের দরজায় পেতলের ডোর-বোল্টে গদরেজের ভারী তালা ঝুলছে। এছাড়াও আছে ডোরলক। সম্ভবত সেটাও লকড্। দরজার ওপর পেতলের নেমপ্লেট। কালো কালিতে খোদাই করা দুটো নাম। রজতশীর্ষ নন্দী। ঠিক নীচেই লেখা আছে ক্ষণপ্রভা নন্দী। নেমপ্লেটটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সত্যশোভন তাঁর পুরুষ্ট গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,—তাহলে জগৎপ্রিয়, লোকটা একা নয়। ফ্যামিলি ম্যান। কিন্তু ক্ষণপ্রভা নন্দীটি কে? স্ত্রী না ভগিনী?

—মা-ও হোতে পারে।

—উঁ হুঁ, মা হোলে মায়ের নামটা আগে থাকতো। সামনের ফ্ল্যাটে খোঁজ টোঁজ নিয়েছ?

—এখনও নিইনি। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

—ওয়েল ঐ তো বেল আছে। পুশ করো।

জগৎপ্রিয় পাঁচনম্বরে বট্‌ম্ পুশ করল। কয়েক সেকেন্ডের পরই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন একজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক। মুখে একটা অবাক লাগা মুখ নয়। যেন মনে মনে প্রস্তুতই ছিলেন। জিগ্যেস করলেন— কিছু বলবেন?

boiRboi.net

সত্যশোভনই এগিয়ে গেলেন,—হ্যাঁ আমাদের পোশাক দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

—থানা থেকে আসছেন তো? কি ব্যাপার বলুন?

—রজতশীর্ষ বাবুর ফ্ল্যাট তো ওটাই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর ওই ক্ষণপ্রভা দেবী?

—ওঁর স্ত্রী।

—গুড, তা ওনারা এখন কোথায়? মানে ঘর তো দেখছি তালাবন্ধ। এ ব্যাপারে আপনারা কিছু জানেন?

—দেখুন, আমি তো বাইরে বাইরে থাকি। আর রজতশীর্ষ বাবুর সঙ্গে আমার তেমন কোন অন্তরঙ্গতাও নেই। তবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ক্ষণপ্রভা দেবীর আলাপ আছে, কথাবার্তাও হয়। যদি বলেন তাহলে আমার স্ত্রীকে ডাকতে পারি।

—বেশ, আপনি ওঁকেই ডাকুন।

—কিন্তু স্যার, ঘটনাটা কি হয়েছে যদি জানা যায়?

—সবই জানতে পারবেন। তার আগে জানা দরকার এঁরা গেছেন কোথায়?

—কোন গণ্ডগোলের ব্যাপার নাকি?

—জানতে পারবেন। আগে আপনার স্ত্রীকে ডাকুন।

ডাকতে হোল না। মহিলা বেরিয়ে এলেন। রোগা রোগা আর পাঁচটা বাঙালি মেয়েদের মতো চেহারা। রঙ ঈষৎ শ্যামবর্ণ। বয়েস আন্দাজ চল্লিশের কাছে। সত্যশোভন মহিলাকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, —ম্যাডাম, ছ নম্বর ফ্ল্যাটের ক্ষণপ্রভা দেবীর সঙ্গে তো আপনার আলাপ ছিল?

—ছিল বলছেন কেন? আছে বলুন। গত বেস্পতিবারই তো ওনার সঙ্গে হকার্স মার্কেটে গিয়েছিলাম। কয়েকটা ব্লাউস পীস কেনার জন্যে।

—আপনার নামটা যদি বলেন?

—ঊর্মিলা ভট্টাচার্য।

—আচ্ছা মিসেস ভট্টাচার্য, ক্ষণপ্রভা মহিলাটি কেমন?

—ভাল। বেশ মিশুকে মহিলা। খুবই সরল প্রকৃতির। আসলে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ মিশুকে মানুষ। তো ওদের সম্বন্ধে এতো কিছু জিগেস করছেন কেন?

সে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে সত্যশোভন জিগ্যেস করলেন,—ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ কেন বলতে পারবেন?

—আসলে ওঁরা দুজনেই তো ঘরের থেকে বাইরে থাকেন বেশি। রজতবাবু কাজ করেন ব্যাঙ্কে, আর ক্ষণপ্রভা দেবী তো বলতে গেলে একজন ছোটোখাটো সেলিব্রিটি। নাচ, গান, অভিনয়, এসব নিয়ে থাকেন। ফলে সারাদিনই ঘর বন্ধ থাকা আশ্চর্য কিছু নয়।

—আজ শনিবার। ব্যাঙ্ক খোলা। রজতবাবু চাকরি স্থলে যেতে পারেন, কিন্তু ওনার স্ত্রী? উনিও কি চাকরি করেন?

—আপনাকে একটা কথা জানানো উচিত। আমরা ওদের শালিকজোড় বলে ডাকতাম। ছুটির দিন বা রবিবার, ওদের ক্লাবের যদি কোন ফাংশান টাংশান না থাকে তাহলে কর্তাগিন্নি দুজনেই কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়েন। তখন ক্ষণপ্রভাদের গানের ক্লাসও বন্ধ থাকে।

—ওনার কি গানের স্কুল আছে?

—স্কুল বলতে উনি বাড়িতেই সপ্তাহে তিনদিন—সোম-বুধ-শুক্র, গানের ক্লাস করতেন। ইদানীং ওদের 'সৃজনমায়ায়' নাটকের রিহার্সাল চলছে। তাই ক্লাস বন্ধ আছে। আমার মেয়েও ওর কাছে গান শেখে।

—সৃজনমায়াটি কি বস্তু?

—একটা কালচারাল ক্লাবে।

—এ ফ্ল্যাটটা কবে থেকে তালাবন্ধ?

উর্মিলার স্বামী বললেন,—কাল সন্ধেবেলা আমি একবার দরজায় নক করেছিলাম। তখন কিন্তু কোন তালা দেখিনি।

—নক করেছিলেন কেন?

—এমনিতে শুক্রবার সন্ধেবেলা গানের ক্লাস থাকে। তবে কাল ছিল না। সেটা জানতাম। আসলে রজতবাবুর সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত দরকারেই নক করতে হয়েছিল।

—ব্যক্তিগত দরকার?

—হ্যাঁ, মানে, একটা লোনের ব্যাপারে—

—রজতবাবু কি সুদের কারবার করতেন?

—আরে, না না, উনি ব্যাঙ্কের লোন অফিসার। একটা লোনের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে একটু অলোচনা করার ব্যাপার ছিল।

—তা বেল পুশ করার পর কেউ দরজা খোলেন নি?

—না স্যার।

amarboi.net

—ওয়েল। ডোর বোল্টে তালাটা কখন থেকে দেখেছেন?

—আজ সকালে। তাই ভাবলাম ওরা হয়তো কোথাও বেরিয়ে গেছেন দু-তিন দিনের জন্যে। যেমন যান।

—আচ্ছা মিসেস ভট্টাচার্য, আপনি তো মোটামুটি বাড়িতেই থাকেন। একটু মনে করে বলুন তো কাল সারাদিনই কী দরজা বন্ধ দেখেছেন?

ঊর্মিলা কিছু মনে করার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন,—এমনিতে ফ্ল্যাটবাড়ির নিয়ম অনুসারে সব ফ্ল্যাটেই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। কিন্তু ক্ষণপ্রভাদের সব সময় বন্ধ থাকতো না। আসলে ওদের ফ্ল্যাটে লোকজন বেশি যাতায়াত করতো। গানের ক্লাসের মেয়েরা আসে, ওদের ক্লাবের লোকজনও আসে। কাল দুপুরের দিকে খোলা ছিল। তখন একজন এসেছিলেন।

—তাকে চেনেন?

—উনি তো প্রায়ই আসতেন। যখন তখন। বোধহয় নাটকটাটক করেন।

—আর কেউ রেগুলার আসতেন?

—হ্যাঁ, মিতা দাস বলে একজন মহিলা, ওদের 'সৃজনমায়ার' সভ্য। উনিও প্রায় আসতেন।

—ভদ্রলোকের নামটা কি জানা আছে?

—পদবি বলতে পারব না। আমি বিশ্বদীপবাবু বলেই জানতাম। ঐ বিশ্বদীপবাবু আর রজতবাবুকে কাল দুপুরে বেরতে দেখেছিলাম।

—কাল দুপুরে? তখন কটা?

—তা ধরুন বেলা বারোটা কি সাড়ে বারোটা হবে।

—তারপর?

—তারপর থেকে আর দরজা খুলতে দেখিনি। অবশ্য সর্বদাই তো আর ওদের ঘরের দিকে নজর দেওয়া যায় না। হয়তো খুলেছিল। নিশ্চয়ই খুলেছিল। নইলে তালা আর লাগাবে কে?

—কিন্তু, বলে সত্যশোভন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডোর-বোল্ট-এর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, —আপনারা বলছেন তালা লাগানো ছিল না, তা কেমন করে হয়?

—আমরা কিন্তু কাল তালা লাগানো দেখিনি।

—না মিসেস ভট্টাচার্য, আপনারা গণ্ডগোল করে ফেলছেন। তালা লাগানো ছিল। থাকতেই হবে।

মিস্টার ভট্টাচার্য কিছুক্ষণ বোকা বোকা মুখে সত্যশোভনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বললেন,—ওহ্, মাই গড্, ইয়েস, তালা লাগানো ছিল। নিশ্চয়ই ছিল, বাট—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সত্যশোভন বললেন,—ইয়েস, ওই 'বাট'। কোন্ আংটায় তালা লাগানো ছিল? আপনারা সেটা নজর করেননি। যারা দরজায়, গোদা বাংলায় যাকে বলে হুড়কো, হ্যাঁ হুড়কো লাগায় তারা দুটো করে আংটার বন্দোবস্ত রাখেন। একটায় তালা ঝোলানো থাকে। সেটা একসঙ্গে দুটো কাজ করে। বাইরে থেকে কেউ যাতে ছিটকিনি টেনে দিতে না পারে সেই জন্যে তারা সেকেণ্ড আংটায় ফলস তালা ঝুলিয়ে রাখে। তারপর যখন আসল বোল্ট লাগাবার দরকার হবে তখন তালাটা প্রথম আংটায় কব্জা ফেলে তালা লাগায়। তাই তো?

—ইয়েস স্যার, তাই। কারণ আমার ঘরেও সেই সিস্টেম আছে।

সত্যশোভন ভট্টাচার্যদের দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন,—নিজেই দেখুন, আপনারাও তালা ঝুলিয়েছেন, কিন্তু সেকেন্ড আংটায়, যাতে করে বাইরে থেকে কেউ হুড়কো টেনে দিতে না পারে। নন্দীদের ফ্ল্যাটে এমনটা যে হয়নি, সেটা কী হলফ করে বলতে পারেন?

মাথা চুলকে মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন,— আয়াম কনফিউজড্ স্যার। হয়তো কাল তালা ঝোলানো ছিল। আমাদের অভ্যস্ত চোখে দেখার ভুল। আসলে আমাদের খেয়াল করাটাই বেখেয়াল হয়ে গেছে। তবে, হয়তো আজ সকাল থেকেই আসল জায়গায় তালা পড়েছে। হয়তো ওরা বেরোবার সময় আজ সকালেই তালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু অফিসার, আজ তো শনিবার। রজতবাবু ব্যাঙ্কে গেছেন। ক্ষণপ্রভা দেবী নিশ্চয় দু চার ঘণ্টার জন্যে কোথাও বেরিয়েছেন। তাই বলে পুলিস আসবে কেন এটাই বুঝতে পারছি না। এনিথিং রং স্যার?

—রং, রং, দেয়ার ইজ আ মিসচিভাস রং।

—হোয়াট ইজ দ্যাট মিসচিভাস রং?

—কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন। আচ্ছা আজ তো শনিবার, অনেকেরই ছুটি থাকে। অন্য ফ্ল্যাটের লোকজনকে পাওয়া যাবে তো?

—পেতে পারেন, মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, পাবেন না তাঁদের যারা ব্যবসাট্যাবসা করেন।

BanglaBook.org

—ঠিক আছে। আপনাদের আর বিরক্ত করব না। আমরা অন্য ফ্ল্যাটে যাচ্ছি। আচ্ছা আপনাদের এই আবাসনে কোন কেয়ারটেকার নেই।

—আছে, নিশুতি, নিশুতি সামন্ত।

—ওকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, বলে সত্যশোভন ওপর আর নীচের ফ্ল্যাটগুলো অনুসন্ধান করলেন। বিশেষ সংবাদ কারো কাছেই পাওয়া গেল না। ফ্ল্যাট বাড়ির যা চিরাচরিত অবস্থা এখানেও তাই। কেউ কারো সাতে- পাঁচে থাকতে চায় না। কেবল সাত নম্বরের ভদ্রলোক অনেকবারই জানতে চাইলেন অ্যাতো খবরাখবরের কারণটা কি? সঙ্গে এও জানালেন, ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা দুজনেই খুব ভালো লোক।

সত্যশোভন হাসলেন,—বললেন এ জগতে ভালো লোকেরাই বেশি বিপদে পড়েন, ওঁরা যে ভালো এবং সহজ লোক সেটাই তো সবাই বললেন।

পাঁচতলার হৃদয়হরণবাবু একটু অন্য কথা শোনালেন, রজতশীর্ষ বাবু প্রায়ই আবাসনের বাইরে থাকতেন, আর ক্ষণপ্রভা বাড়ি থাকলেও ওনার অনেক বয়ফ্রেন্ড ছিল। মহিলা নাচ গান অভিনয় সব ব্যাপারেই খুব পারদর্শিনী ছিলেন। ফলে অনেক লোকজন ওনার কাছে যাতায়াত করতেন, অনেক রাত পর্যন্ত হই হট্টগোল চলতো। মাঝে মাঝে মিউজিক রিহার্সালও চলতো।

—তা এ ব্যাপারে অন্য ফ্ল্যাটওনাররা কিছু আপত্তি করতেন না?

— নাহ্, আর পাঁচজনের সঙ্গে ওদের, বিশেষ করে ক্ষণপ্রভা দেবীর ব্যবহার এতো সুন্দর ছিল, এসব ব্যাপার নিয়ে কেউ তেমন উচ্চবাচ্য করতো না। তাছাড়া অনেকেরই মেয়েরা ওর কাছে নাচ গান শিখতো তাই সবটাই সয়ে গিয়েছিল। রজতশীর্ষ বাবুর কাছে কেউ কেউ নানারকম অ্যাডভান্টেজও নিত, ফলে কেউই আর—

—তা এতে করে রজতশীর্ষ বাবুর কোন অসুবিধা হোত না? উনি তো আর নাটক করতেন না।

—সেরকম কিছু শুনিনি। তবে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকলে একটু-আধটু ঠোকাঠুকি, সে তো সব ঘরেই আছে তবু, ওই যে বললাম শালিকজোড়।

—একটা কথা কি আপনি মনে করে বলতে পারবেন, সত্যশোভন জিগ্যেস করেন, মহিলা তো নাটক-টাটক করতেন বলেছেন?

হৃদয়হরণ বললেন,—উনি ইনভলভ্ ছিলেন তবে নিজে নাটক করতেন কিনা জানি না দেখিওনি। ওদের সংস্থা 'সৃজনমায়ার' সঙ্গে বেশ দহরম মহরম ছিল।

সম্ভবত উনি ডিরেক্টার বা ওই ধরনের কিছু একটা ছিলেন। মানে লোকে যা বলতো।

একটু থেমে হৃদয়হরণ জিগ্যেস করলেন,—তা স্যার ওদের সম্বন্ধে এতো কথা জিগ্যেস করছেন কেন? কোন অপ্রীতিকর কিছু ঘটেছে নাকি?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে সত্যশোভন বললেন,—স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ইদানীং কোন মনোমালিন্যের সংবাদ কি পেয়েছেন?

—এটা অবশ্য হলফ করে বলতে পারব না। ক্ষণপ্রভা দেবীর বয়ফ্রেন্ডের সংখ্যা কিন্তু অনেক ছিল। ওই পর্যন্তই। তবে বেলেল্লাপনা কিছু দেখিনি। আর দুজনেই খুব ভদ্র। দেখা হোলে হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন। সময় পেলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চা-জলখাবার খাওয়াতেন। তবে একটু আধটু ড্রিঙ্কসের হ্যাবিটটা ছিল।

—ওটা কোন প্রবলেম নয়। তা ওঁদের কোন ইস্যু?

—না স্যার, ওটাই সম্ভবত ওদের একটা ট্রাজিডি। দে হ্যাভ নো ইস্যু। কিন্তু স্যার ঘটনাটা কি?

সত্যশোভন একবার হৃদয়হরণবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—এরকম কি আপনার কখনও মনে হয়েছে কোন রকম মনোমালিন্য বা ঝগড়াঝাটির কারণে দুজনের কেউ আত্মহত্যা করতে পারেন?

—আত্মহত্যা? ওই শালিকজোড়? না স্যার। মনে তো হয় না। ঝগড়ার থেকে বন্ধুত্বটাই ওদের মধ্যে বেশি ছিল। আর খুব পরোপকারীও ছিলেন। ওদের দ্বারা সম্ভব এমন কোন কাজ আপনি যদি ওদের দ্বারস্থ হন, আমি বলতে পারি খালি হাতে আপনি ফিরবেন না। সেই জন্যেই তো ব্যাঙ্ক লোন পাবার আশায় রজতবাবুর কাছে অনেকেই যেতেন।

—হুঁ। তাহলেও তো ভাবার ব্যাপার।

—কেন স্যার?

—আজ ভোররাতে রেললাইনে একটা বডি পাওয়া গেছে। আমাদের সন্দেহ সেটা রজতশীর্ষ বাবুর।

—অ্যাঁ, হৃদয়হরণ চমকে উঠলেন, বলেন কি মশাই? রজতশীর্ষ আত্মহত্যা করেছে? না না, এ বিশ্বাসই হয় না। ব্যাঙ্কে অত বড় চাকরি। স্ত্রীও অনেক রোজগার করেন। প্র্যাকটিক্যালি টাকাকড়ির কোন অভাবই ওদের ছিল না। শুনেছি বছর বছর ঘটা করে স্বামী স্ত্রী বেড়াতে যান। 'সৃজনমায়ার' কোন শো

BanglaBook.org

থাকলে দুজনেই উঠে পড়ে লাগেন শো টাকে ভালো করার জন্যে। নাহ্ স্যার, রজত কিছুতেই আত্মহত্যা করতে পারে না।

—তবে কী খুন? রজতশীর্ষবাবুর কি কোন শত্রু ছিল?

—এই তো একটা ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন করলেন। এ প্রশ্নের কোন উত্তর আমার জানা নেই। রজতের ব্যক্তিগত কোন শত্রুর সন্ধান আমি কেমন করে দিই বলুন?

—তা তো বটেই কিন্তু মহিলা গেলেন কোথায়? এনিওয়ে আমরা সৃজনমায়ায় ওঁর খবর নিচ্ছি। ঠিকানাটা কি?

—আপনি স্যার কেয়ারটেকার কিংবা সেক্রেটারির কাছে খবর নিলে পেয়ে যাবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার তেমন ইনটারেস্ট নেই।

—ঠিক আছে। দরকার পড়লে পরে নিশ্চয় আপনাদের সহযোগিতা পাব।

—সে আর বলতে।

সত্যশোভন আর জগৎপ্রিয় নিচে নেমে এলেন। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটেরই দরজা বন্ধ। নামতে নামতে জগৎপ্রিয় জিগ্যেস করল,—স্যার, ঘরগুলো একবার খোঁজ নেবেন নাকি?

—কিছু লাভ হবে না। তারপর যেই শুনবে রেললাইনে রজতশীর্ষর লাশ পাওয়া গেছে, সবাই আরও বেশি করে কুলুপ আঁটবে মুখে। দরকার পড়লে পরে দেখা যাবে। তার আগে দরকার ওর স্ত্রীকে, মহিলার কাছে খবরটা পৌঁছনো খুবই দরকার। চল দেখি কেয়ারটেকারকে পাওয়া যায় কি না।

নীচে নামতেই একটি বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের যুবকের সঙ্গে দেখা। যুবকটি ওপরেই আসছিল। দুজন পুলিসকে নামতে দেখে স্বভাবতই আড়ষ্ট। ওকে থামালেন সত্যশোভন নিজেই—আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন?

যুবকটি বলল, —হ্যাঁ স্যার। আমি তো এ বাড়ির কেয়ারটেকার, বাড়ির পিছনে একতলায় আমার আলাদা ঘর আছে। আমার নাম নিশুতি সামন্ত। মানে নিশুতি রাতে হয়েছিলুম তো, তাই—

—গুড। আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

—কেন স্যার?

—রজতশীর্ষ নন্দী বলে এক ভদ্রলোক এ বাড়িতে থাকেন, সেটা জানো?

—কি যে বলেন স্যার! এই ফ্ল্যাটবাড়ির সবারই নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা।

—তাহলে তো তুমিই ভালো বলতে পারবে, সকাল বেলা তোমাদের ফ্ল্যাটের মেইন গেট কখন খোলা হয়, নিশুতিবাবু?

—বাবুটাবু বলবেন না স্যার। আমি নেহাতই কেয়ারটেকার, তা স্যার সে রকম বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। মোটামুটি পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় কেউ না খুললে আমিই খুলে দিই।

—কেউ না খুললে মানে? যে কেউ যখন-তখন খুলতে পারে নাকি?

—আজ্ঞে স্যার, যদি কারো দরকার পড়ে, এই তো হপ্তাখানেক আগে, দোতলার ঘোষবাবু ধৌলি একস্‌প্রেস ধরবেন বলে ভোর চারটের সময়ে বেরুলেন, ফাস্ট লোকালে শিয়ালদা, তারপর ছটার মধ্যে হাওড়া, তা অত ভোর রাতে আমাকে না ডেকে নিজেই গেট খুলে চলে গেছেন।

—তার মানে সবার কাছেই মেইন গেটের চাবি আছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—আজ সকালে কখন খোলা হয়েছে? এবং কে খুলেছে?

—আজ্ঞে আমিই খুলেছি। তা ধরুন তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা হবে। তখন অবশ্য কেউ যাতায়াত করেনি।

—তার আগে কেউ বেরিয়েছে এমন কোন ঘটনা কি মনে আছে?

—না স্যার, বলেই যুবকটি থেমে গিয়ে বলল, খুব আবছা একটা শব্দ পেয়েছিলাম, লোহার গেটে তালা খোলা বা বন্ধ করার। কিন্তু,—

—কিন্তু,—

—অত রাতে আর উঠতে ইচ্ছে হয়নি।

—তখন রাত কটা হবে?

—ঘড়ি তো দেখিনি স্যার, তা আড়াইটে তিনটে হোতে পারে।

—রাত আড়াইটে তিনটের সময় কেউ যাতায়াত করে নাকি?

—দরকার হোলে করতেও পারে। কারো অসুখবিসুখ করলে—

—সকালে খোঁজ নাওনি?

—না স্যার, ব্যাপারটা ভুলেই গেছি।

—এ লাইনে কি সারারাতই ট্রেন চলে?

—আজ্ঞে স্যার, মেইন লাইন তো, ভোর রাতে কয়েকটা দূরপাল্লার ট্রেন তো আসেই। কখনও কখনও ট্রেনের টাইমে গণ্ডগোল হোলে মাঝরাতেও ট্রেন এসে যায়। কিছু হয়েছে নাকি স্যার?

সে কথার জবাব না দিয়ে সত্যশোভন জিগ্যেস করলেন,—ক্ষণপ্রভা নন্দী তো ওনার স্ত্রী?

BanglaBook.org

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তিনি কোথায় গেছেন বলতে পারবে?

—কেন স্যার, ওনার ঘরে নেই?

—সম্ভবত নেই। কারণ ঘরে তালা ঝুলছে।

—অনেক সময় স্যার ফল্‌স্ রিঙে তালা ঝোলে।

—না, এখন আসল রিঙেই ঝুলছে।

—তাহলে হয়তো কাল ওনারা ফেরেননি।

—তার মানে এখনও ওনারা বাড়িই ফেরেননি?

—ক্ষণাদির শো-টো থাকলে ফিরতে দেরি হয়। নইলে হয়তো দুজনেই বাইরে কোথাও গেছেন। মাঝে মাঝেই এরকম হয়।

—ঠিক আছে, তোমাদের ক্ষণপ্রভা দেবী বাড়ি ফিরলেই লোকাল থানায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবে, খুব জরুরী। আজ ভোররাতে ওনার হাজব্যান্ডের দু টুকরো বডি পাওয়া গেছে রেললাইনে।

হতবাক যুবকটিকে ওই অবস্থায় রেখে সত্যশোভন আর জগৎপ্রিয় রাস্তায় নেমে এলেন।

৫

দিন দুয়েক পর বিকেলের দিকে থানায় বসে জগৎপ্রিয় বলল,—স্যার এ ব্যাপারে কি আপাতত আমাদের আর কিছু করার নেই?

—কী করতে চাও? একমাত্র ওই ছেলেটির সামান্য ইনফরমেশন ছাড়া আর কেউ আমাদের কাছে কোন অভিযোগ করেনি নট ইভন, আ মেম্বার অব হিজ ফ্যামিলি। আচ্ছা ওই ছেলেটির যেন কি নাম ছিল?

—কে স্যার? ওই সেদিন সকালে যে প্রথম খবর দিল? ও তো স্যার লোকাল লোক। শ্যামচাঁদ না কি যেন নাম।

—তা, সেই শ্যামচাঁদের কথার ওপর বেস করে আমরা অকুস্থল থেকে একটি ডেডবডি পাই, তার পকেট থেকে পাওয়া যায় তার নাম ঠিকানা। সেই ঠিকানায় খোঁজ করে আমরা একটা তালাবন্ধ ঘর পাই। কিন্তু খবর পাঠানো সত্ত্বেও তার স্ত্রীর কোন খবর এখনও পাইনি। আমরা আমাদের ডিউটি মতো জি. আর. পি. কে জানিয়েছি। তারা বডি মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। অ্যাকসিডেন্ট লিস্টে নাম ঠিকানা সমেত নোটিস টাঙিয়ে দিয়েছে। এরপর কেসটা লোকাল থানা হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। আসুক, তখন দেখা যাবে।

—একটা ব্যাপারে আমি খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি স্যার, দেখতে দেখতে তিনদিন হোতে চলল, খবরের কাগজে রেলে কাটা পড়া যুবকের খবর ছাপা হোয়ে গেছে। নাম ঠিকানা সমেত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ খোঁজ করল না। নট ইভন হিজ ওয়াইফ।

—দেখো গিয়ে হয়তো খবরটা চোখে পড়েনি। মেয়েটির সম্বন্ধে যা শুনলাম, সে তো নাচ গান করে বেড়ায়। নিজের খেয়ালে মেতে আছে।

—এটাও আশ্চর্য লাগছে, তার ওপর সবাই ওদের বলে শালিকজোড়। একবার স্যার ওই 'সৃজনমায়ায়' খবরটা নিতে গেলে হোত না? কিম্বা ভদ্রলোক যে ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন সেখানে খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে তো।

—জগৎপ্রিয়, এই কেসটায় আমি এখনও পর্যন্ত তেমন কোন উৎসাহ পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে সিম্পল সুইসাইড কেস। তবে তোমার যদি কাজ দেখাবার খুব ইচ্ছে হোয়ে থাকে গো অ্যাহেড। আসলে আমরা এখন কতরকম ঝামেলায় ফেঁসে আছি বল তো? ওই মাস্তান তোলাবাজ দীনবন্ধুর কেসটা নিয়ে রেগুলার খবরের কাগজগুলো লোক তাতিয়ে যাচ্ছে। নাকি আমাদের প্রশ্রয়ে দীনু বেটা অবাধে সাম্রাজ্য বিস্তার করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ঘটনাটা তো সত্য নয়। অনেকদিন থেকেই আমরা দীনবন্ধুকে চোখে চোখে রেখেছি। ব্যাটাকে কোনদিনও হাতে নাতে ধরতে পারিনি। খুব ধুরন্ধর লোক। ওকে অ্যারেস্ট করতে না পারলে কেলোর কীর্তি হয়ে যাবে। এর মধ্যে কে না কে এক রজতশীর্ষ সুইসাইড করেছে, তা নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করলে তোমার দীনবন্ধু হাতছাড়া হয়ে যাবে। সে খেয়াল আছে?

—সবই বুঝি স্যার। দীনবন্ধুরা সব পলিটিক্যাল ছাতার তলায় আছে। ওদের চট্ করে ধরাও যায় না, ধরলেও ছেড়ে দিতে হয়। কেন ছাড়তে হয় সেটা পাবলিক বোঝে। কিন্তু সেই পাবলিকই আবার তেতে ওঠে আর এক রাজনৈতিক দলের উসকানিতে। এ এক অদ্ভুত গ্যাঁড়াকলে রাজত্বে বাস করছি আমরা। এগোলেও আঁটকুড়ো পেছলেও তাই।

কথার মাঝেই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

সত্যশোভন বললেন,—তোল জগৎপ্রিয়। দেখ আবার কোত্থেকে হুলিয়া এলো?

ফোন তুলে জগৎপ্রিয় চিরশ্রুত শব্দটি উচ্চারণ করল, —হ্যাল্লো, বড়পুকুর পুলিস স্টেশন, কোত্থেকে বলছেন, ওহ্, আই সি, আশ্রয় আবাসন, হ্যাঁ, কি

BanglaBook.org

হয়েছে বলুন, কি বললেন, ওহ, মাই গড, না না, আপনাদের কিছু করার দরকার নেই, আমরা আসছি এখুনি।

ফোন নামিয়ে রেখে জগৎপ্রিয় সত্যশোভনের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাল।

—কী ব্যাপার, তোমার ভ্রূ কুঁচকে গেল কেন? আশ্রয় আবাসনে আবার কি ঘটল?

—স্যার, ব্যাপারটা কি রকম ঘোরালো মনে হচ্ছে। আমাদের বোধহয় এখুনি যাওয়া দরকার।

—আগে বলবে তো কি হয়েছে?

—আশ্রয় আবাসনের যে ঘরটায় আমরা তালা মারা দেখে এসেছি—

—তুমি বলছ রজতশীর্ষ নন্দীর ফ্ল্যাট?

—হ্যাঁ স্যার, সেখান থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরচ্ছে। গন্ধে আশপাশের লোক টিঁকতে পারছে না।

—হোয়াট, বলে সত্যশোভন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, —ফ্ল্যাটের মধ্যে, দুর্গন্ধ? বলেই আবার বসে পড়লেন—বললেন, বিচিত্র নয়, বেশ কয়েকদিন হোল বন্ধ হয়ে আছে, হয়তো ইঁদুর টিঁদুর মরেছে।

—তবু স্যার আমাদের একবার যাওয়া দরকার। বলা যায় না, কেঁচো খুঁজতে সাপও বেরতে পারে।

শেষপর্যন্ত সেই সাপই বেরলো। ওরা যখন গিয়ে পৌছল আবাসনের নীচে ভীড়ে ভীড়। সবাই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে চাপা গুঞ্জন। সত্যশোভন আর জগৎপ্রিয়কে আসতে দেখে সেদিনের সেই কেয়ারটেকার নিশুতি এগিয়ে এল,—স্যার আপনারা এসে গেছেন, ভালোই হোল, ছ নম্বর ফ্ল্যাট স্যার একদম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

—জ্বালিয়ে দিয়েছে মানে?

—দেখছেন না, বাড়ি ঘর ছেড়ে সব নীচে নেমে এসেছে। টেঁকা যাচ্ছে না। এমন গন্ধ ছাড়ছে, অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার জোগাড়।

নিশুতির দেখাদেখি আরও কয়েকজন এগিয়ে আসে, তাদেরও বক্তব্য একই। সবাইকে আশ্বস্ত করে সত্যশোভন আর জগৎপ্রিয় ওপরে উঠে যান। ফ্ল্যাটের দরজার সামনে আরও কয়েকজন নাকে কাপড় চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জায়গাটা সত্যিই দুর্গন্ধময়। দাঁড়ানো যায় না। গা গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু করার কিছুই নেই। পুলিসের চাকরি। দণ্ডায়মানদের মধ্যে এক বয়স্কা মহিলা ছিলেন।

সত্যশোভন তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন,—শনিবারের পর আর কেউ আসেননি এ ফ্ল্যাটে?

মহিলা বললেন, —যতদূর জানি আর কেউ আসেনি।

—আপনি কোন ফ্ল্যাটে থাকেন?

—আট নম্বর, মানে ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটে।

—গন্ধটা কখন থেকে পাচ্ছেন?

—দিনদুয়েক হোল অল্প অল্প পাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম কোন ইঁদুরটিদুঁর মরেছে। কিন্তু ইঁদুর বা ছুঁচো মরলে এতো উগ্র গন্ধ বেরতো না।

—আপনার কি মনে হয়?

পাশ থেকে হৃদয়হরণবাবু বললেন,—দেখুন অফিসার, আমাদের মনে হওয়ার কোন দাম নেই। তাছাড়া আমরা তো আর ভেতরে কি আছে না আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি না। এবার যা করার আপনারাই করুন।

—বলতে পারেন মিসেস নন্দী আর ফিরেছিলেন কিনা?

—মনে হয় না। তাহলে নিশুতি জানতে পারতো। কারণ ওনার স্বামীর মারা যাবার খবর পেলে আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করতে যেতো।

—ঠিক আছে, তাহলে দরজা ভাঙতেই হচ্ছে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কাছাকাছি কোন চাবিওয়ালা পাওয়া যাবে?

—না স্যার, চট করে পাওয়া যাবে না, কেউ একজন উত্তর দিলেন।

—তাহলে তালাটা যে ভাঙতে হয়। আচ্ছা আপনাদের কারো শাবল-টাবল কিছু আছে?

—নিশুতির কাছে থাকতে পারে, হৃদয়হরণই বলেন, যদি বলেন তাহলে ওকে ডাকি।

—হ্যাঁ তাই ডাকুন, আর বড় সাইজের হাতুড়ি থাকলে সেটাও আনতে বলবেন।

তিন-চার মিনিটের মধ্যে শাবল আর হাতুড়ি সমেত নিশুতি হাজির। সে একটা রুমাল নাকে বেঁধে নিয়েছে।

—স্যার, আর কিছু লাগবে?

—লাগবে। আমার যতদূর মনে হচ্ছে তালা ছাড়াও ডোর লক করা আছে। ওর ডুপ্লিকেট চাবিও নিশ্চয় আপনাদের কাছে আছে।

—কিন্তু স্যার সেক্রেটারি বাবু তো এখনও আসেননি। এখনই কি তালা ভাঙা উচিত হবে?

boiRboi.net

—তোমার সেক্রেটারি বাবু যদি পাঁচদিন পরে আসেন, এ বাড়ির লোকদের কি ততদিন অপেক্ষা করলে চলবে? যাও নিয়ে এসো। ইমিডিয়েট দরজা খোলার দরকার। না পেলে দরজা ভাঙতে হবে।

—ঠিক আছে স্যার, বলে নীচে চলে গেল নিশুতি।

সাব ইন্সপেক্টর জগৎপ্রিয় বেশ স্বাস্থ্যবান পুরুষ। রীতিমত সুদেহী আর ব্যায়াম করা তাগড়াই শরীর। গদরেজের তালার মধ্যে শাবল ঢুকিয়ে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ক্রমাগত হাতুড়ির আঘাত করতে শুরু করল।

সত্যশোভন বললেন,—আমাদের চাবিওয়ালাকে নিয়ে আসতে পারলে এতো পরিশ্রম করার দরকার হোত না।

হাতুড়ি চালাতে চালাতে জগৎপ্রিয় বলল, —তাতে আরও খানিকটা সময় নষ্ট হোত। হানিফ কোথায় কখন থাকে ঠিক কি?

বলতে বলতেই ডোর বোল্টটা খানিকটা আলগা হয়ে এলো। আসলে গদরেজের তালা চট্ করে ভাঙা শক্ত। অবশ্য এখন যে কোন তালাই চাবিওয়ালাদের কাছে কোন প্রবলেম নয়। শেষপর্যন্ত নাটবল্টু সমেত পুরু ডোর বোল্টটা তেবড়ে বেঁকে উপড়ে এলো দরজা থেকে। কিন্তু সমস্যা হোল ডোর লক নিয়ে। সেটাও গদরেজ। কিছুক্ষণ পর নিশুতি এসে বলল, স্যার ডুপ্লিকেট চাবি পেলাম না। সবই সেক্রেটারি সাহেবের জিম্মায় আছে। তিনি না এলে তো!

এইসব কথার মধ্যেই সেক্রেটারি অসিত দে নামে বছর পঞ্চাশের কাঁচাপাকা চুলের এক ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছেন। তাকে দেখে নিশুতি বলল,—স্যার, ইনিই হচ্ছেন অসিতবাবু, আমাদের সেক্রেটারি।

সত্যশোভন বললেন,—ছ নম্বর ফ্ল্যাটের ডোর লকের ডুপ্লিকেট চাবিটা আপনার কাছে আছে?

—না স্যার।

—কেন?

—বাড়ি তৈরি হবার সময় সব ঘরেই প্রমোটার বাবু একই কোম্পানির চাবি লাগিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্ল্যাটে প্রবেশ নেবার পর প্রায় সকলেই নিজের মতো চাবি পাল্টে নিয়েছেন। দু'একজন ছাড়া আর কারো ডুপ্লিকেট চাবি আমাদের কাছে নেই। রজতশুভ্রবাবুর চাবিও আমাদের কাছে নেই।

—তাহলে তো দরজা ভাঙতেই হচ্ছে। এই যে নিশুতি মনে হচ্ছে তোমার গায়ে জোরটোর আছে। আমাদের জগৎ সাহেবের সঙ্গে একটু গা লাগাও।

—ঠিক আছে স্যার,—

বার দশেক মোক্ষম ধাক্কার পরই একপাল্লার দরজা লক ভেঙে খুলে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল কেউ যেন দুম করে মর্গের দরজা হাট করে দিয়েছে। এতোক্ষণ অতি উৎসাহে যারা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও ওয়াক শব্দ তুলে তরতরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গেল।

সময় নষ্ট না করে জগৎপ্রিয় প্রথমে পরে নিশুতি আর সত্যশোভনবাবু ঢুকে গেলেন। দু কামরার সুসজ্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। দরজা জালনায় দামি পর্দা ঝুলছে। সুদৃশ্য সোফাসেট। অনেকগুলো নানা রঙের ব্যাকপিলো। দামি সেন্টার টেবিল। এককথায় সব মিলিয়ে যে কথা জোর গলায় সোচ্চার হতে চায় তা হোল রজতশীর্ষর আর্থিক অবস্থা বেশ, বেশ সচ্ছল।

আর ঠিক তখনই যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল সেটা এই সুন্দর ঘরে শয়তানের উচ্ছিষ্ট। টেবিলের ঠিক নীচেই চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে এক মহিলার মৃতদেহ। সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে। চিনতে অসুবিধা হবে চেনা লোকেরও। কানের দুপাশ দিয়ে আর নাক বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের স্রোত জমাট বেঁধে গেছে। দামি কার্পেটেও শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ফোঁটা।

দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলেও বিকট দুর্গন্ধটা একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না সত্যশোভন। কিছু একটা আঁচ করে সম্ভবত তৈরি হোয়েই এসেছিলেন। পকেট থেকে এক শিশি ওডিকোলন বার করে ঘরের মধ্যে এলোপাথাড়ি ছড়িয়ে দিলেন। সেটা ফুরিয়ে যেতে এদিকে ওদিকে নজর দিতে দিতে চোখে পড়ল ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা রুম ফ্রেশনারের বট্‌ল। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি সেটিকে নিঃশেষ করলেন। তবু গন্ধ যায় না। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বডিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। সর্বাঙ্গ তো ফুলেছেই, নাক মুখ চোখ ফুলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে করে তার অতি পরিচিতও সনাক্ত করতে সময় নেবে।

মিসেস ভট্টাচার্য চলে যাননি, নাকে কাপড় চাপা দিয়ে তিনি ঘরের ভেতর এসেছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে সত্যশোভন জিগ্যেস করলেন,—দেখুন তো ম্যাডাম, এই বডিটা আইডেন্টিফাই করতে পারেন কিনা?

মহিলা কোন রকমে কাছে গিয়ে দেখতে দেখতে বললেন,—মনে হচ্ছে ক্ষণপ্রভা।

—কি করে বুঝলেন? মানে, আর ইউ কনফিডেন্ট?

—দুটো জিনিস দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে।

—কি কি?

—একনম্বর প্রথম আঙুলে পরা মুক্তোর আংটি।

—শতকরা নব্বইজন এখন ওই আঙুলে ওই আংটি পরেন।

—তা পরে, কিন্তু মুক্তোর সাইজটা দেখেছেন? হায়দ্রাবাদ থেকে কিনে আনার পর ক্ষণপ্রভা আমায় মুক্তোটা দেখায়। অনেকে অত বড় সাইজের মুক্তো দিয়ে আংটি বানাতে চায়নি। কিন্তু একজন বানিয়ে দিয়েছিল।

—বেশ, আর একটা কি চিহ্ন?

—খয়েরি রঙের বড় লাল টিপ। এটা ওর এক ধরনের শখ। আমরা অনেকবারই বলেছি এখন অতো বড়ো টিপের চল উঠে গেছে। কেউ পরে না। তাতে ক্ষণা বলেছিল, কেউ পরে না বলেই তো ও পরছে। আসলে ওর স্বভাবটাই ছিল ওই রকম। কেউ যেটা করে না সেটাই ও করতো।

—দেন ইউ আর সিওর?

—ওর ঘরে আর অন্য কার দেহ পড়ে থাকবে বলুন? তাছাড়া যে শাড়িটা পরে আছে সেটাও আমার চেনা।

—জগৎ, এখুনি মোবাইলে মর্গে ফোন কর। ইমিডিয়েট বডি সরিয়ে দিতে হবে। আর কিছুক্ষণ থাকলে সারা বাড়ির লোক অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

জগৎপ্রিয় মোবাইল নিয়ে বারান্দায় চলে গেল। ঊর্মিলা জিগ্যেস করলেন,

—আপনার কি মনে হয় পুলিস সাহেব, ক্ষণাকে কেউ মেরে রেখে গেছে? নাকি আত্মহত্যা করেছে?

—এখন আমরা কোন কিছুই বলতে পারব না। বডি কনডিশান দেখে মনে হচ্ছে প্রায় তিনচারদিন আগে মহিলার মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য পোস্ট মর্টেম ডিটেলসে বলতে পারবে?

—আর ওনার স্বামী?

—সেটাই আর এক মিসট্রি। মহিলার যদি তিনদিন আগে মৃত্যু হয় তাহলে সেই দিন রাত্রেই রজতশীর্ষবাবুও সুইসাউড করেছেন।

—কী বলছেন? উনিও সুইসাইড করেছেন? আমরা শুনছিলাম ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে—

—না, সেটাও আমরা ডেফিনিট নই? চলুন নীচে যাই। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা সবারই স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। চিন্তা করবেন না, লাশ খুব শীগগিরই রিমুভ করা হবে। চলুন বাড়ির সবার একটা করে জবানবন্দী নিতে হবে।

দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন লাশ নিয়ে মর্গের লোকেরা চলে গেল। পুলিস ফোটোগ্রাফার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নিয়ে নিলেন। সারা বাড়িতে ফিনাইল আর ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হোল। ইত্যবসরে সত্যশোভন তাঁর জিজ্ঞাসাবাদে বাড়ির বাসিন্দাদের কাছ থেকে যা জানতে পারলেন, সেটি খুবই মামুলি। হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে ভাবভালোবাসা ছিল খুবই। ওঁদের লাভ ম্যারেজ। মাস আটেক হোল ওঁরা ফ্ল্যাট কিনে এখানে এসে উঠেছেন। পড়শিদের সঙ্গে বেশ সুন্দর ব্যবহার করতেন। মিশুকে বলে বেশ জনপ্রীতি ঘটে গিয়েছিল। দুজনের মৃত্যুতে সবাই বেশ মর্মাহত।

এরই ফাঁকে জগৎপ্রিয় দু'একজনকে টুকটাক প্রশ্ন করে। কোন বিশেষ কাউকে নয়। যাকে যেমন পেয়েছে। তার সারাংশ হোল বছর আষ্টেক হোল ওঁরা বিয়ে করেছেন। দুজনেরই রোজগার ভালো। মহিলা নাচ গান আর অভিনয়ে খুব পটু ছিলেন। বাসিন্দাদের অনেকেই ওনার পারফরম্যান্স দেখেছেন। তারিফ করার মতো মহিলা ছিলেন যথেষ্ট সুন্দরী। ক্ষণপ্রভা নামটি সার্থক। তৃতীয় কোন ব্যক্তির উপস্থিতির কথা জিগ্যেস করায় সেই ঊর্মিলাই ফের বিশ্বদীপের কথা বলেন।

কথাটা সত্যশোভনের কানে গিয়েছিল। উনি জিগ্যেস করলেন,—বাট, এই বিশ্বদীপ লোকটা কে? থাকে কোথায়?

এই থাকার ব্যাপারটা তেমন সঠিকভাবে কেউই বলতে পারল না। প্রত্যেকেই 'সৃজনমায়া'র নাম করল।

হৃদয়হরণবাবু, আর ঊর্মিলা দেবী দুজনেই বললেন,—গত শুক্রবার দুপুরের দিকে বিশ্বদীপ ওই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। বিশ্বদীপ প্রায়ই দুপুরের দিকে আসতেন।

—তখন কী রজতশীর্ষ থাকতেন?

—কি করে থাকবেন? ওনার তো অফিস। বিশ্বদীপবাবুকে আমি দেখতে পেতুম এই কারণে যে, আমার মেয়েকে ওই সময় স্কুল থেকে আনতে যেতে হোত।

—আর উনি ফিরে যেতেন কখন?

—সেটা তো ঠিক বলতে পারব না। হয়তো নিশুতি বলতে পারবে।

নিশুতি পাশেই ছিল। সত্যশোভন ওকে জিগ্যেস করাতে ও বলল,—গত শুক্রবার দুপুরে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে সত্যশোভন বললেন,—বেছে বেছে ওই দিনই তুমি সিনেমা গেলে? তোমার তো সারাদিনের ডিউটি।

BanglaBook.net

—আজ্ঞে সেক্রেটারি সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিলুম। মাসে একদিন আমার ছুটি পাওনা।

—একাই গিয়েছিলে?

—না স্যার! আমার সঙ্গে বঙ্কা গিয়েছিল। ওপাশের ফ্ল্যাটের কেয়ার-টেকার।

—কি সিনেমা?

—আজ্ঞে, কহনা কিসিসে পেয়ার হ্যায়। খুব ভালো বই স্যার।

—তার মানে তুমি জানো না সেদিন দুপুরে কেউ এসেছিল কিনা?

—আজ্ঞে না। তবে কর্তাগিন্নি কেউই সেদিন বাড়ির বার হননি।

—কি করে জানলে সেদিন ওরা দুজনে বাড়িতেই ছিলেন? রজতবাবুর অফিস ছিল না?

নিশুতি একটু ভেবে নিয়ে বলে, —আজ্ঞে, সেদিন নন্দীবাবু হয়তো ছুটি নিয়েছিলেন। সিনেমা দেখে আমি বাড়ি ফিরে আসি সন্ধ্যে ছটা নাগাদ। তখন বেল দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠান রজতশীর্ষবাবু। ওনার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। সিগারেট আনতে দিলেন। তখনও ওদের পরনে ছিল বাড়ির পোশাক। রজতবাবু পরেছিলেন লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। ক্ষণপ্রভাদি পরেছিলেন হাউসকোট।

—হাউসকোট! সত্যশোভন ভাবতে ভাবতে বললেন, কিন্তু ক্ষণপ্রভাকে আমরা দেখছি শিফন জর্জেট শাড়িতে। এনিওয়ে, আমরা সেটা পরে ভেবে দেখছি।

—কিন্তু স্যার, ছ নম্বর ফ্ল্যাট কি খোলাই পড়ে থাকবে?

—না। পুলিস ঘর সিল করবে। আপাতত কেয়ারটেকার হিসেবে তুমি ওখানে পাহারায় থাকবে। আমরা একজন মিস্তিরি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে এসে দরজা মেরামত করে ঘরে তালা দিয়ে দেবে। জগৎপ্রিয় একটা সিজার লিস্ট করে নাও। তারপর এদের কয়েকজন আর সেক্রেটারিবাবুকে দিয়ে সই করিয়ে নেবে। আমি থানায় গিয়ে মিস্তিরি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

৬

দেখতে দেখতে আরও চোদ্দ পনের দিন কেটে গেল। রেলপুলিস তাদের প্রাথমিক কাজটুকু করে পি. এম. রিপোর্ট সমেত লোকাল থানায় রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সত্যশোভনবাবুর দল আর কোন জায়গায় পৌঁছতে পারলনা। দুজনেরই পোস্টমার্টেম রিপোর্ট এসে গেছে। ক্ষণপ্রভাদেবীর মৃত্যু ঘটেছে

স্ট্র্যাঙ্গুলেশনে। অতর্কিতে গলায় নাইলন ফাঁস টেনে তাকে মারা হয়। মৃত্যুর আগে বাঁচার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। সারা শরীরের নার্ভে প্রবল উত্তেজনা ছিল সেটা ধরা পড়েছে। অর্থাৎ তাঁকে খুন করেছে বেশ শক্তিশালী পুরুষ। হয়তো তিনি কোথাও বেরুবার উদ্যোগ করছিলেন। মৃতার ঠোঁটে অস্পষ্ট হলেও লিপস্টিকের ক্ষীণ আভাস ছিল। এছাড়াও কপালে একটা বড়ো মাপের কফি কালার ভেলভেট টিপ আটকানো ছিল। কিন্তু সেটি কপালের মাঝখানে না থেকে কপালের ডানদিকে সরে যাওয়া অবস্থায় আটকে ছিল। এটাও প্রমাণ করে মরার আগে মহিলা বাঁচার জন্যে ছটফট করেছিলেন। ডানহাতে একটি লেডিজ রিস্টওয়াচ পাওয়া যায়। ঘড়ি চলছিল। কারণ ঘড়িটা কোয়ার্জ। কিন্তু জোর আঘাতে ঘড়ির কাচ ভেঙে যায়। বাঁ হাতের অনামিকায় ছিল একটি হীরের আংটি আর ডান হাতের তর্জনীতে ছিল মুক্তোর আংটি। দুটোই খোলার উপায় ছিল না। কারণ বডি ফুলে ফেঁপে যাওয়ার দরুন সেগুলি চেপে বসেছিল। গলার সোনার চেনে হাত না পড়ায় বোঝা যায় খুন করার উদ্দেশ্য অর্থের কারণে নয়।

ওদিকে রজতশীর্ষের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট একটু অন্যরকম। ভদ্রলোকের স্টমাকে পাওয়া যায় বেশি পরিমাণ মদ। আর কপালের ডান দিকে জোর আঘাতে থ্যাঁতলানো দাগ। কেয়ারটেকার নিশুতির ভারসন অনুযায়ী রজতশীর্ষের পরনে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি ছিল না। ছিল শার্ট প্যান্ট। পায়ে স্লীপার। ব্যাগে টাকা আর কিছু ভিজিটিং কার্ড। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন কোম্পানির। সত্যশোভন কার্ডের নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার আগেই টুকে রেখেছেন। ভদ্রলোকের হাতেও ছিল তিনটে মূল্যবান পাথরের আংটি। অর্থাৎ রজতশীর্ষবাবু ভাগ্যে বিশ্বাস করতেন। নিশ্চয় ওনার ছক বা কোষ্ঠী দেখাবার অভ্যাস ছিল। অভ্যাস যে ছিল তার নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় রজতশীর্ষের মনিব্যাগে। ভাঁজকরা একটা কম্পিউটার ফোরকাস্ট রিডিং, রজতশীর্ষের নাম লেখা। সত্যশোভন অ্যাস্ট্রলজির কিছুই বোঝেন না তবু সেটির একটি জেরক্স করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। পরে কোন ভালো জ্যোতিষীকে দিয়ে দেখিয়ে নেবেন। সত্যিই ওর কোন মৃত্যুযোগ ছিল কিনা।

সত্যশোভনকে চিন্তিত দেখে জগৎপ্রিয় জিজ্ঞসা করে—আচ্ছা স্যার আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না একপেট মদ খেয়ে লোকটা গভীর রাতে ঘর লক করে ডোর বোল্টে গোদরেজ তালা লাগিয়ে হেঁটে হেঁটে রেললাইনে গিয়ে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল? এতো কিছু করতে পারল, কেবল কোন সুইসাইড নোট রাখল না। এটা কিভাবে হয়? লোকটা একটা ভালো ব্যাঙ্কে চাকরি করতো।

কিছুদিন আগে ফ্ল্যাট কিনেছে। তার মানে টাকাকড়ির খুব একটা অভাব ছিল না। স্ত্রীরও রোজগার ছিল। তাহলে?

সত্যশোভন হাসেন, বলেন,—আরে ভায়া কেবলমাত্র অর্থই তো আর সব খুনের মোটিভ হয় না। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে।

—হ্যাঁ স্যার, আমারও তাই মনে হয়। আর সেই কারণটাই খুঁজে বার করতে পারলে এই জোড়া মৃত্যুর কংক্রিট সলিউশনে আশা যেত। মহিলার ক্লাবে কোন খোঁজ নিয়েছিলেন?

—নিয়েছিলাম, সেলিব্রিটি না হলেও মোটামুটি পপুলার মহিলা। ক্লাবে কারো সঙ্গে কোন বিদ্বেষ বা মনোমালিন্য ছিল না। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেই চাইতেন।

—এই বিশ্বদীপবাবুটা কে?

—ওটাই গণ্ডগোলের কেস। ক্লাবের কেউ বিশ্বদীপ ঘোষ নামে কাউকে চেনে না। তার চেহারার কোন আভাসও তারা দিতে পারেনি। অর্থাৎ বিশ্বদীপ ওদের কাছে অপরিচিত অথচ ঊর্মিলা দেবী বলছেন বিশ্বদীপ নাকি ক্লাবের ড্রামাডাইরেক্টর, অ্যান্ড অলসো হি ইজ অ্যান অ্যাক্টর। কোনটা ধরব? মুশকিল কি জানো, এই বিশাল কলকাতা শহরে কে একজন বিশ্বদীপ। নাহ্, খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ বিশ্বদীপ ঘোষ নামে তেমন কোন নামি অভিনেতার নাম শুনিনি।

—তাহলে এখন কি করবেন?

—কী আর করব! জগতে অনেক কেসই আনসল্‌ভড্ হয়ে আছে। এটাও তাই হবে। রজতশীর্ষ বা ক্ষণপ্রভার কোন আত্মীয়স্বজনেরও খবর নেই। ক্লাবও কোন হদিশ দিতে পারেনি। আবাসনের লোকেরাও নয়।

—স্যার একবার অফিসে খোঁজ নিলে হোত না?

—একটা রুটিন ইনভেস্টিগেট করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে বড় জোর দেশের বাড়ির ঠিকানা থাকতে পারে। অবশ্য সেই ঠিকানা ধরে যদি খোঁজ খবর মেলে, একটু থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি জগৎপ্রিয়, আমাদের থানাতেই এতো কেস জমে গেছে, চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, এপাড়া ওপাড়া, এ পার্টি ও পার্টি দাঙ্গা হাঙ্গামা, খুনজখম, তার জেরেই অস্থির। আর মার্ডার টার্ডার এখন এতো ওপন, সবার চোখের সামনে খুন হোল, সবাই চেনে খুন করা লোকটা কে, কিন্তু কেউ সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসবে না। তুমি তদন্ত করে পাবে কি? ছেঁড়া ছাতা? এখন তো পুলিসকে গালাগাল দিতে পারলে পাবলিকের সব থেকে বেশি আনন্দ। আসলে বোঝে না আমরা শালা না

ঘরকা না ঘাটকা।

—তাই বলে কি স্যার তদন্ত থেমে থাকবে?

—তুমি রজতশীর্ষ আর ক্ষণপ্রভার কেসটা বলছ তো? ওই স্টেট লেভেলে যা হবার হবে। আর আমাদের মুশকিলটা কি জান, এ কেসে কারো কোন অভিযোগ নেই। ফ্ল্যাটের লোকজনের ছাড়ো ছাড়ো ভাব। কদিন তানানা করে চলবে। তারপর দেখবে একসময় ধামাচাপা পড়ে গেছে। তোমার মনে আছে, বেশকিছুদিন আগে পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে ভিখিরি মারা শুরু হোল। একটা দুটো না অনেকগুলো ঘটনা। কাগজ তাতালো। শহরবাসী তাতলো। তারপর?

—হ্যাঁ স্যার, ব্যাপারটা ভারি রহস্যজনক রয়ে গেল। একজন লোককে ধরা হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও খুন হয়েছে অনেকগুলো। কেন এতো খুন, কি জন্যে বেছে বেছে ভিখিরি বধ, বোঝাই গেল না। খুনের শাস্ত্রে বলে যে কোন মার্ডারের পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। স্টোনম্যানের উদ্দেশ্য বিধেয়ের নো ট্রেস। এখন, সম্ভবত লোকে সেসব কথা ভুলে গেছে।

—ইয়েস। এটাও তাই হবে। একদিন ধামাচাপা পড়ে যাবে।

—স্যার, আপনার ইচ্ছে করে না?

—কি?

—কেসটা নেড়েচেড়ে দেখতে। আসলে খুব ইন্টারেস্টিং কেস বলেই বলেছি।

—ফাঁকি দেওয়াটা আমার চরিত্রের বাইরে, তবু বলি, এলাকার ঝঞ্ঝাট নিয়ে এতো কাবু হয়ে আছি, তার ওপর বয়েস, বয়েস ইজ আ ফ্যাক্টর। এখন আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু করতে ইচ্ছে করে না।

জগৎপ্রিয় কোন উত্তর দেয় না। মাথা নীচু করে নখ দিয়ে টেবিলের কাঠ খুঁটতে থাকে।

৭

শ্যামচাঁদ হনহন করে এন্টালি মার্কেটের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আটটা পঁচিশের কল্যাণী লোকালটা ধরতে হবে। একটা প্রাইভেট লোহার কারখানায় ও কাজ করে। লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। আগে কলকাতাতেই থাকতো। একটা বস্তি অঞ্চলে। তখন ওর বাবা বেঁচে। মাথার ওপর একটা বোনও ছিল। মা তো অনেক আগেই গত হয়েছিলেন। তখন ছিল ছন্নছাড়ার দিন। শ্যামচাঁদের তখন কাজটাজ করতে ভালো লাগতো না। কিছুদিন মিশেছিল বাপে খ্যাদানো মায়ে

BanglaBook.org

তাড়ানো ছেলেদের দলে। সে এক অস্থিরতার দিন। তারপর পুলিসের ঠ্যালায় সে দলটাও ভেঙে গেল। কেউ কেউ কাজকর্ম জুটিয়ে এদিক ওদিক ছিট্‌কে গেল। শ্যামচাঁদ একা একা অনেকদিন এদিক ওদিক ঘুরে শেষ পর্যন্ত এই লেদ কারখানাতেই কাজ শিখতে ঢুকে পড়েছিল। তারপর একসময় সে মিস্তিরি হয়ে গেছে। বাপ মারা যাবার আগেই বোনের বিয়ে দিয়েছে। বিয়ে করেছে নিজেও। স্বপ্নাদের নিজেদের বাড়ি। বাপের একটিই মেয়ে। একটু যা দূর। জগদ্দল থেকে রোজ ট্রেনে আসতে যেতে হয়। বাকিটা নিশ্চিন্ত জীবন। হয়তো এটাই সে চেয়েছিল। একটা কাজ, স্বপ্নার মতো বউ। সবই ঠিক চলছিল। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ একটা কাঁটা তার মনের মধ্যে বিঁধে আছে। মাঝে মধ্যেই কাঁটাটা খচ্‌খচ্‌ করে জ্বালাতে থাকে।

এর আগে সে কোনদিনও কোন ট্রেনে কাটা পড়া লোক দেখেনি। তবু যা হোক সেটা সে মানিয়ে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই লোকটার কোন দুখ্যুটুখ্যু ছিল তাই আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তারপরের ঘটনাটাই তাকে ভাবিয়ে তুলছে। লোকটা নাকি 'আশ্রয় আবাসনে' থাকতো, ইদানীং পরপর অনেকগুলো ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে। তারই একটা 'আশ্রয়'। এই সব ফ্ল্যাট বাড়ির একজন লোক সুইসাইড করেছে রেললাইনে। এবং সেটা প্রথমেই তার নজরে পড়ে। আর সব থেকে ভাবার কথা লোকটার বউটাকেও কে যেন খুন করে গেছে। প্রায় তিন দিন পর বউটার পচাগলা দেহ পাওয়া যায়। শ্যামচাঁদের খচখচানি সেখানেই। একজন খুন হোল। আর একজন আত্মহত্যা করল। তার মানে কি লোকটা বউটাকে খুন করে তারপর গিয়ে ট্রেনের তলায় মাথা দিয়েছে?

সে যতদূর খবর রাখে পুলিস এখনও কিছু হদিশ পায়নি। বেশ কয়েকদিন একে তাকে নানারকম প্রশ্ন ট্রশ্ন করে চুপ করে গেছে। সামনের রবিবার এলে একমাস হবে। আসলে এ সব তার ভাবার কথা নয়। সে তো আর পুলিস বা গোয়েন্দা নয়। কিন্তু তার খুব জানতে ইচ্ছে করে আসল সত্যটা কি? বউটাকে কে মারল? কেন মারল? আর লোকটাই বা কেন মরল? খুবই জটিল ব্যাপার। হয়তো কোনদিনও এর উত্তর সে জানতে পারবে না। কিন্তু রহস্যের শেষটা তার জানতে খুব ইচ্ছে করে।

—কিরে, মাথা নীচু করে হনহনিয়ে কোথায় চললি? বাড়ি?

সত্যিই শ্যামচাঁদ অন্যমনস্ক হয়েছিল। মুখ তুলে যাকে দেখে তাকে দেখার জন্যে ওর কোন প্রস্তুতিই ছিল না। খানিকটা বিস্ময়ে দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শ্যামচাঁদ বলল,—তুই? অবচেতন মনে বোধহয় তোর কথাই ভাবছিলাম।

—অবচেতন মন? এসব কথা শিখলি কোত্থেকে? স্বপ্না নিশ্চয়ই?

—তা জানি না, তবে বিশ্বাস কর।

—অমনি গুল ঝেড়ে দিলি? এই মুহূর্তে আমার কথা ভাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে?

—আছে, কারণ আমি যতদূর জানি তুই হচ্ছিস গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জির ডানহাত। ওঁর সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে তুই নিজেই এখন গোয়েন্দা হয়ে গেছিস।

—মাইরি! গোয়েন্দা হওয়া অতো সোজা ব্যাপার? যাকগে সে সব তুই বুঝবি না, বেড়ে আছিস, চাকরি করছিস, ঘরজামাই হয়ে সুখে সংসার করছিস। তোকে দেখে কে এখন বলবে যে একদিন তুই আমার মাস্তানদলের পেটোবাজ ছিলি?

শ্যামচাঁদ হাসে, হাসতে হাসতেই বলে, —তোকে দেখেই বা কে বলবে তুই একদিন মালখোর, গাঁজাখোর, মাস্তান ছিলি। এখন দিব্যি ছিমছাম চেহারার ভদ্রলোক হয়ে গেছিস। সেদিন আমাদের সেই লক্কা—

—কে লক্কা?

—বারে, এরই মধ্যে ভুলে গেলি, লক্কা মানে লোকেন সাধুখাঁ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি হয়েছে তার?

—খারাপ কিছু না। সে তো এখন হাতিবাগানের ওদিকে একটা দোকান দিয়েছে। মেয়েদের সায়া ব্লাউজ বিক্রি করে। সেই বলল, তুই নাকি পুলিসে জয়েন করছিস?

—পরীক্ষা দিয়েছি। এখন বিকাশদা একটু ধরপাকড় করলেই—

—বিকাশদা কে?

—বিকাশদা, বিকাশ তালুকদার। ওসি, যাক সেকথা, তা আমার কথা কেন ভাবছিলি সেটাই বল।

—হ্যাঁ, বলব। তার আগে একটা চায়ের দোকানে বসতে পারলে হোত। চল ওই প্রাচীর গায়ে একটা চা সিঙারা কচুরির দোকান আছে। আজ আমি তোকে খাওয়াব।

—বেশ, তাই চ। খেতে আমার কোন আপত্তি নেই। বিশেষ করে অন্যের পয়সায়।

—তুই শালা এখনও আগের মতো রয়ে গেছিস। তোর গুরু এই ব্যাপারে তোকে এখনও টিট্ করতে পারলেন না।

দোকানের পিছন দিকে দুটো জায়গা পেয়ে গেল। শ্যামচাঁদ কচুরি আর মিষ্টি গজার অর্ডার দিয়ে একটা বিড়ি ধরাল।

boiRboi.net

—তুই এখনও বিড়ি খাস? তোর বউ কিছু বলে না?

—বলে না আবার। কিন্তু কি করব বল? একবার বিড়ির নেশা ধরলে আর সিগারেটে পোষায় না। খাবি নাকি একটা বিড়ি?

—দে, কিন্তু জমিয়ে তো বসলি, তোর দেরি হয়ে যাবে না? তুই তো সেই জগদ্দলের দিকে থাকিস না? তা দেরি হলে তোর বউ বকবে না?

—আরে বাবা, অ্যাদ্দিন পর দীপুবাবুর সঙ্গে দেখা। নয় একটু বউয়ের বকুনি খাব।

কচুরি এসে গিয়েছিল। খেতে খেতে দীপু বলল,—এবার বল তো চাঁদ, তোমার খাজুরে বক্তব্যটা কী?

কচুরি চিবোতে চিবোতে চোখ বুজিয়ে শ্যামচাঁদ কিছু চিন্তা করল। তারপর একেবার প্রথম দিন থেকে, মানে রজতশীর্ষের রেললাইনে মাথা দিয়ে মরে পড়ে থাকা থেকে ক্ষণপ্রভার খুন হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বলে ও থামল। দীপুর দিকে তাকিয়ে দেখল, বেশ মনোযোগ দিয়ে দীপু ওর সব কথা শুনে যাচ্ছে। শ্যামচাঁদ থামতে দীপু বলল—ওই রজতশীর্ষ না কি যেন নাম বললি, তার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?

—কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে।

—তা যাদের ভাবনা তারাই ভাবুক। অলরেডি তো লোকাল পুলিস কেসটা টেকআপ করেছে, যা করার তারাই করবে।

—মনে তো হয় না। বেওয়ারিশ লাশ নিয়ে পুলিসের অতো মাথাব্যথা নেই। আজকাল পুলিসের কাছে ডায়রি লেখাতে গেলেও টাকা দিতে হয়।

—যাহ্ বাজে কথা। এই যে তুই, লাশটা দেখে প্রথমেই থানায় গিয়ে রিপোর্ট করলি। তোকে কি টাকা খরচ করতে হয়েছে?

—না, তা নয়। কিন্তু এরপর যদি তুই আরও এগোতে চাস, ট্যাঁক হাল্কা না করলে ওরা তোর কথা শুনবেই না।

—তোর ধারণাটা ভুল। বিকাশদার সঙ্গে তোর আলাপ নেই। আমি ভদ্রলোকের পেছনে লাগি। সেটা লোক দেখানো। কিন্তু আলাপ থাকলে বুঝতিস লোকটা তার কাজের ব্যাপারে কত সিনসিয়ার। তা এখন তুই কি করতে চাস?

—যা করতে চাই সেটা করতে গেলে টাকা লাগে। সেটা আমার নেই। তাই মনের ইচ্ছেটা মনেই থেকে যাবে।

—অর্থাৎ তুই তদন্ত চাস?

—কেন জানি না, ঠিক কি হয়েছিল সেটা জানতে খুব ইচ্ছে করছে। তোর কি মনে হয়, কী হতে পারে?

—দূর পাগল। এভাবে কি কিছু বলা যায়? না তা সম্ভব? ঠিক আছে, তোর ব্যাপারটা আমি মনে রাখব। নীলদার সঙ্গে একটু কথা বলি। সেরকম ইন্টারেস্টিং মনে হলে নীলদা হয়তো কেসটা অ্যাকসেপ্ট করতেও পারে।

—আমি কিন্তু ট্যাকখালির জমিদার।

দীপু হাসল। মাথা দোলাতে দোলাতে বলল,—নীল ব্যানার্জি এমন একজন মানুষ যে সব সময় টাকার পেছনে ছোটে না। সত্যিই যদি তার মনে হয় কেসটা নেড়েনেচে দেখার মতো, দেখবি নিজেই ইন্‌ভলড্ হয়ে গেছে। আসলে লোকটা একটু অন্যরকম। ঠিক আছে আমি নীলদার সঙ্গে কথা বোলব।

৮

কার্ডটা দেখে সত্যশোভনবাবু ভ্রূটা প্রথমে কোঁচকালেন। তারপর নীলের দিকে তাকিয়ে সেই ভ্রূ সোজা হোল, ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠল এক চিলতে হাসি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন নীলের দিকে। করমর্দন করতে করতে বললেন,—দ্য ফেমাস ইনভেস্টিগেটর, ওয়েলকাম, বসুন।

দীপুও সঙ্গে ছিল। তিনজনে বসার পর সত্যশোভনবাবুই বললেন,—এবার বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি? এনি প্রবলেম?

নীল সামান্য হাসল। তারপর বলল,—বলতে পারেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এসেছি।

—কি রকম?

সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল,—মাসখানেকেরও বেশি হবে। আপনার এলাকায় একটা মিস্টেরিয়াস ঘটনা ঘটেছে।

—আমার এখানে তো নিত্য একটা না একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। সেগুলোকে ঠিক মিস্টেরিয়াস ঘটনা বলা যায় না। বলা যায় নটোরিয়াস ঘটনা, তবে—

—হ্যাঁ, আমি সেই 'তবে'র ব্যাপারে একটু ইন্টারেস্টেড।

—মানে 'আশ্রয় আবাসনের' ঘটনাটা?

—ইয়েস, ওটা মিস্টেরিয়াস নয়?

—অফকোর্স। কিন্তু আপনি, মানে আপনাকে কে অ্যাপয়েন্ট করল?

—সে এক মজার ব্যাপার। আপনাদের এখানকার একটি ছেলে তার নাম শ্যামচাঁদ, মানে যে ছেলেটি এফ. আই. আর. করে—

—হ্যাঁ, শ্যামচাঁদ, সে এখানে আসছে কেমন করে?

—তার হঠাৎ সত্যদর্শনের ইচ্ছা জেগেছে। দীপু, মানে আমার এই সহকর্মীটির বন্ধু। তার কাছে সব শুনে আমি নিজেও ব্যাপারটা একটু ঘেঁটে দেখতে চাইছি। ইফ ইউ হ্যাভ নো অবজেকশান।

—অন্য কেউ হলে অযাচিত নাক গলানোর জন্যে সরাসরি না বলে দিতাম। কিন্তু আমার কাছে নীল ব্যানার্জির একটা আলাদা খাতিরের জায়গা আছে। ইয়েস, আই হ্যাভ নো অবজেকশান। কিন্তু কেসটার ব্যাপারে আমি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে ডিভোট করতে পারছি না। এখানকার আইন পরিস্থিতি বেশ খারাপ।

—সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।

জগৎপ্রিয় এতোক্ষণ পাশের চেয়ারে বসে সব শুনছিল। আসলে ও নিজে থেকেই কেসটায় মাথা গলাতে চাইছিল। কিন্তু সে অধস্তন কর্মচারী। ওপর মহলের চাপ না থাকলে তার কিছুই করার নেই। নীল ব্যানার্জির এহেন প্রস্তাবে সে মনে মনে বেশ উৎসাহিত হোল। একবার সত্যশোভনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, —স্যার যদি কিছু না মনে করেন আমি কি একটা কথা বলতে পারি?

—তুমি যা বলবে সেটা আমি আন্দাজ করতে পারছি, ঠিক আছে তোমার মুখ থেকেই শোনা যাক।

—স্যার, আমি জানি আপনি অনেক নচ্ছার কেস নিয়ে বর্তমানে ব্যতিব্যস্ত, তাই এই সাধারণ একটা খুন আর একটা আত্মহত্যা নিয়ে আপনি—

সামান্য অসহিষ্ণু হয়ে সত্যশোভন বললেন,—তোমার মোদ্দা কথাটা বল।

—মিস্টার ব্যানার্জি যদি এই কেসটা হাতে নেন তাহলে আমি ওনাকে মদত দিতে পারি। অবশ্য উনি যদি চান।

নীল বলে ওঠে, —আরে এ তো গুড প্রোপজাল, যে থানার আন্ডারে এই অঘটন সেখানকার এস. আই, যিনি গোড়া থেকে অনেক সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, দ্যাট উইল বী গুড ইনাফ ফর মি। ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। আই নীড ইওর হেল্প।

—থ্যাঙ্কু স্যার। আপনি ইনভেস্টিগেশন কবে থেকে শুরু করতে চান?

—আজ হোলে কাল নয়।

একটা বাধার প্রশ্ন তুললেন সত্যশোভন, বললেন—কিন্তু আপনার রেমুনারেশন, আফটার অল ইউ আর আ প্রোফেশনাল ইনভেস্টিগেটর।

প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজতে গুঁজতে নীল বলল, —যদিও আমি বিশ্বাস করি স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পের পরমায়ু বেশিদিন হয় না। যে

কোন কর্মই, তা সে শিল্পকর্মই হোক বা অন্যকিছুই হোক, টাকা ইজ আ গ্রেট ফ্যাক্টর। টাকা পাওয়া যাবে না এমন একটা কাজের প্রতি অনুরাগ খুব একটা বেশিদিন থাকে না। তবে, সেই অর্থে গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা নয়, নেশা। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে ভদ্রলোক কোন একটা খুনের তদন্তে আমাকে নিয়োগ করলেন, আলটিমেটলি দেখা গেল তিনিই খুনি। তখন কিন্তু টাকা পাবার সব আশা জলাঞ্জলি দিতে হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেওছে। তবে ওই যে বললাম, আয়াভ আ গুড বিজনেশ ফর মাই সিকিওরিটি। ও ব্যাপারে আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আপনি কেবল আমায় প্রয়োজনীয় সাহায্য করলে ইট উইল ডু আ লট।

—ঠিক আছে আপনি এগোন। আর জগৎপ্রিয় তো রইল। ওই আপনাকে হেল্প করবে। নাউ গো অ্যাহেড। আমি ওপরঅলার সঙ্গে কথা বলে নোব।

নীল এবার কাজের কথায় ফিরল। জগৎপ্রিয়র উদ্দেশ্যে বলল,—আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।

—জগৎপ্রিয় কর।

নীল হো হো হেসে উঠল। এবং দীপুও। সে এতোক্ষণ তার চরিত্রের বাইরে গিয়ে চুপ করে বসেছিল। উপযুক্ত সুযোগ পেয়েই বলল,—আপনি জগতের প্রিয় হতে চান। কাকে বলছেন জগৎপ্রিয় করতে?

জগৎপ্রিয় হেসে ফেলল, —হ্যাঁ আমার সার নেমটায় একটা আদেশের সুর আছে। খানিকটা হুকুমদারিও বলতে পারেন। জগৎপ্রিয় কর। কাকে বলছি তা জানি না। তবে সারনেমের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আদেশের সুর রয়ে গেছে। সে যাক। কি বলবেন বলুন?

—দুটো স্পটই আমি আজই দেখতে চাই। আপনি কী আমাকে কম্পানি দেবেন?

জগৎপ্রিয় তার স্যারের দিকে তাকাল। স্যার, মানে সত্যশোভন বললেন,

—ওক্কে বয়। গো অ্যাহেড টু ওপন দ্য ব্ল্যাক কার্টেন অব আ মিস্টেরিয়াস ইনসিডেন্ট অর অ্যাকসিডেন্ট।

৯

ওরা প্রথমেই গেল সেই রেল লাইনের কাছে যেখানে রজতশীর্ষর গলাকাটা শরীরটা পাওয়া গিয়েছিল। মাসখানেক কেটে গেছে তারপর। অনেকক্ষণ ধরে জায়গাটা বাজের চোখ দিয়ে দেখল। এখন কোন কিছু ক্লু পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

BanglaBook.org

একমাস, বড্ড গ্যাপ হয়ে গেছে। তারপর অনেক ট্রেনই পাস করে গেছে এই লাইনের ওপর দিয়ে। বেশ কয়েকবার বৃষ্টিও হয়ে গেছে। ওরা রেললাইন ধরে কিছুটা হেঁটে পুলিসের দেওয়া হোয়াইট ইনডিকেশন মার্কটার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। মোটা অস্পষ্ট হলেও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল।

—জগৎপ্রিয়বাবু!

—হ্যাঁ স্যার বলুন,—

—ঠিক কি অবস্থায় বডিটা পড়েছিল?

—উপুড় হয়ে। আমার ধারণা ভদ্রলোক অন্ধকার থাকতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। তারপর ট্রেন আসার আগেই তিনি নিজের গলাটা লাইনে প্লেস করে দেন।

—আপনি সিওর, ভদ্রলোক নিজে এসে গলা দিয়েছিলেন। অন্য কেউ জোর করে ওকে শুইয়ে দিয়ে যায়নি?

—সন্দেহটা আমার এসেছিল। কারণ ভদ্রলোকের পি. এম. রিপোর্ট বলছে উনি তখন ছিলেন ফুল ড্রাঙ্ক। মানে জাগতিক ব্যাপারস্যাপারগুলো তখন ওর কাছে হেজি। তারওপর শক্ত কিছু দিয়ে আঘাতের দাগ ছিল ডানদিকের রগে। যে ভাবে বডিটা পড়েছিল তাতে মনে হয় না কেউ ওঁকে জোর করে লাইনের ওপর শুইয়ে রেখেছিল। অবশ্য ভরপেট মদ গিললে তার নিজের শরীরের ওপর তাৎক্ষণিক কোন মমত্ব থাকে না। বেহেড মাতাল হোলে একটা ডেসপারেট ভাব এসে যায়। তখন সে কি করছে না করছে তার কোন খেয়ালই থাকে না। তবে এক্ষেত্রে দুটোই হোতে পারে। দুটো সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। রগে আঘাতের চিহ্নটা যে আবার অন্য কথা বলছে।

—অর্থাৎ, খুনও হোতে পারে আবার সুইসাইডও হোতে পারে?

—বললাম না যেকোন একটা হোতে পারে।

—কিন্তু বেহেড মাতাল হয়ে বাড়ি থেকে বেরবার সময় তার শরীর এবং পায়ের ব্যালান্স ঠিক থাকে না। আপনাদের 'আশ্রয় আবাসন' থেকে রেল লাইনের দূরত্ব কতখানি? আন্দাজেই বলুন।

—তা আপনার, মাইল খানেক হোতে পারে।

—আপনাদের এখানে কোন নাইট পোস্টিং থাকে না?

—থাকে, রাতপাহারায় কিছু টহলদার কনস্টেবল থাকে। তবে তারা ঠিক কেমনভাবে থাকে সেটা সঠিক বলতে পারব না।

নীল আর দীপু যুগপৎ জগৎপ্রিয়বাবুর দিকে তাকায়।

—তার মানে বলছেন আপনাদের পুলিস ডিপার্টমেন্ট ঠিকমতো কাজ করে না?

—আমার গায়ে এখন উর্দি আছে। সেটা বলা মানে নিজেদের গায়ে থুতু ছেটানো। তবে, নেহাৎ ইমারজেন্সি কেস না থাকলে রাত-পাহারার গতি একটু ঝিমোনোই হয়।

— অর্থাৎ পুলিসের চোখ এড়িয়ে ভদ্রলোক অতো রাতে টলতে টলতে রেললাইনে গেছেন। রেললাইনটা আবার প্লেন লাইন থেকে খানিকটা উঁচুতে। একজন বেহেড মাতালের পক্ষে এবড়োখেবড়ো মাটি টপকে লাইনের কাছে যাওয়া এবং সব থেকে বড় কথা, মানে, বলতেই হচ্ছে, ভদ্রলোক জাতে মাতাল হোলেও তালে ঠিক ছিলেন। নইলে, এখান দিয়ে দুটো লাইন গেছে, এবং এ জায়গাটায় রেলের লাইটপোস্ট নেই। ভদ্রলোক তাল ঠুকতে ঠুকতে ঠিক লাইনে শুয়ে পড়েছিলেন। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নো সুইসাইড নোট। পেয়েছেন নাকি কোন সুইসাইড নোট?

—না পাইনি। বাট, মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?

—নাহ্, তেমন কিছুই নয়। আমি কেবল ঘটনাগুলোর স্যাটিসফ্যাক্টরি জবাব খুঁজতে চাইছি। ওনার কাছে কি কি পাওয়া গেছে তার নিশ্চয়ই একটা সিজার লিস্ট আছে?

—হ্যাঁ আছে, ওসি সাহেব নিজেই সব কিছু কালেক্ট করেছেন।

—পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ওরা স্টমাকে লিকার ছাড়া আর কি কিছু পেয়েছে?

—নাহ্, একমাত্র রগে চোট লাগা ছাড়া আর তেমন কিছু নিশ্চয়ই পায়নি। পেলে জানতে পারতুম।

—ঠিক আছে জগৎপ্রিয়বাবু, এবার চলুন আমরা একবার ওনাদের ফ্ল্যাটে যাব।

সঙ্গে গাড়ি ছিলনা। ওরা তিনজন হেঁটেই চলে এলো আশ্রয় আবাসনে। ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেল নিশুতির সঙ্গে। বোধহয় কোথাও বের হচ্ছিল।

জগৎপ্রিয়কে দেখে ও থমকে দাঁড়াল।—স্যার, আজও কি ওই ঘরে যাবেন?

—হ্যাঁ, কেন তোমার কোন আপত্তি আছে নাকি?

—না না আপত্তি করব কেন? আর কেনই বা করব? আপনারা পুলিস, যান, ওপরে চলে যান। তা স্যার আমাকে যদি বলেন, তাহলে আমিও আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি।

—নাহ্, থাক তোমার যাবার কোন দরকার নেই।

ওরা তিনজনে ওপরে যেতে থাকে। নিশুতি একবার ওদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টিয়ে নিজের কাজে চলে যায়। ছ নম্বরের দরজায় তালা বন্ধ। পুলিস তালা লাগিয়ে গেছে। জগৎপ্রিয়র কাছে চাবি ছিল। ঘরে ঢুকে জগৎপ্রিয় আলো জ্বালিয়ে দেয়। জানলাগুলো সব বন্ধ আছে। ঘরের মধ্যে একটা ভ্যাপসানি গন্ধ। আলো জ্বালতে কিছুটা পরিষ্কার হোল। জগৎপ্রিয়র নতুন কিছু দেখার ছিল না। সে একধারে দাঁড়িয়ে রইল।

জিনিসপত্র, আসবাব, যেখানকার যা তেমনই আছে। বিছানার চাদর বেশ দুমড়ানো আর কোঁচকানো অবস্থায় ছিল। বোঝা যায় সেখানে কোন কারণে ধ্বস্তাধস্তির ব্যাপার ঘটেছিল। মাথার বালিশ ঠিক থাকলেও পাশবালিশ দুটোর একটা মাটিতে পড়ে আছে। ঘরের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলতার ছাপ।

—আপনারা এ ঘরের কোন ছবিটবি নিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ মিস্টার ব্যানার্জি, ফর্মাল কাজ সবই করা হয়েছে। এমনকি ডেডবডির ছবিও নেওয়া হয়েছে। তবে চিনতে পারবেন না। বডি পচে ফুলে গিয়েছিল।

—দেওয়ালে তো কয়েকটা ছবি আছে। এগুলো চিনতে পারেন?

—দুজনকে চিনতে পারছি। একজন ওই ভদ্রমহিলার আর একজন রজতশীর্ষ বাবুর, বাকিদের জানি না। হয়তো এদের দুজনের কারো বাবা মা হতে পারেন।

—হুঁ, বলে নীল আলমারির কাছে চলে গেল। সাবেকি মেহগিনি কাঠের আলমারি। চাবি কি হোল থেকে ঝুলছে। চাবি ঘোরাতেই খুলে গেল। হ্যান্ডেল ধরে টানতেই সবটা ওপন হয়ে গেল। ভেতরে মেয়েদের শাড়ি শায়া ব্লাউজের ভিড়। অধিকাংশই দামি শাড়ি। এটা সেটা দেখতে দেখতে বেরলো একটা মদের বোতল। ব্যান্ড নিউ। খোলা হয়নি। খুব দামি বোতল। শীভাস রিগ্যাল। দীপু পেছন থেকে বলে উঠল,—মালটা বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। মাইরি বলছি কোনদিন খাইনি এ জিনিস।

—চুপ কর। এখানে কি মাল খেতে এসেছিস?

নীল আবার নিজের কাজে মন দিল। আলমারির দ্বিতীয় খোপের শাড়িটাড়ি সরাতে দেখলো পিছনের কাঠের পাটাটা যেন খানিকটা এগিয়ে আছে। অনেকক্ষণ ও গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকল। এক সময় পকেট থেকে ছোট্ট হ্যান্ড টর্চটা বার করে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখতে থাকল। কাঠেরই রঙের একটা গোল স্পট যেটা মিশে আছে কাঠের পাটার গায়ে আপনা থেকে তৈরি হওয়া প্রাকৃতিক ডিজাইনের সঙ্গে মিশে আছে। কি খেয়াল হোতে সেই গোল জায়গাটায় বুড়ো আঙুলের চাপ দিল, এবং বাকি দুজনকে হতভম্ব করে দিয়ে

একদিকের কাঠটা সটান ওপরে উঠে গেল।

—বোঝ, নীল বলল, এ তো হিড্‌ন চেম্বার।

চেম্বারের মধ্যে চোখ ফেলতেই দুজনের চোখে ফের বিস্ময়। থাক থাক বান্ডিল করা নোট, একশো, পাঁচশো, হাজার।

—কত হবে বল তো মাইরি, লকারের সাইজটা দেখেছ? লাখ দশেক হবে?

—বেশিও হতে পারে।

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল জগৎপ্রিয়বাবুকে ডাকল,—এদিকে একবার আসবেন নাকি, মিস্টার কর?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বলে জগৎপ্রিয় এগিয়ে আসে।

—আচ্ছা মিস্টার কর, আপনি কি বলতে পারেন মিস্টার নন্দী আই মিন রজতশীর্ষবাবু কি করতেন? আমি শুনেছিলাম উনি নাকি স্টেটব্যাঙ্কে চাকরি করতেন?

—হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনেছেন।

—যে পোস্টেই উনি চাকরি করুন না কেন এতো টাকা কী রোজগার করা সম্ভব?

লকারের মধ্যে চোখ রেখেই জগৎপ্রিয় চমকে উঠে বলে,—নিশ্চয়ই না। আর এটাও একটা ভাবার দিক। এতো টাকা? হাউ? কেমন করে হয়?

—এই লকারে কিছু না হলেও লাখ পনেরো বিশ টাকা আছে। তাও এখনও সব কিছু দেখা হয়নি।

—চলুন না মিস্টার ব্যানার্জি আমরা আরও কিছু নেড়েচেড়ে দেখি।

—হ্যাঁ, চলুন। তা এই টাকাকড়ির খানাতল্লাশি আপনারা করেননি?

—করা হয়েছিল। তবে কাঠের আলমারির এই লকারটা অনেকটা চোরা গোপ্তার মতো। ওপর থেকে বোঝা যায় না যে ওটা একটা লকার। আর ওটার পেটে এতো কিছু আছে তা আমরা ভাবতে পারিনি।

কিছু না বলে নীল ওর কাজে মন দিল। চলল চূড়ান্ত খোঁজাখুঁজি। সাবেকি আলমারির আরও কিছু লুকনো খোপ থেকে পাওয়া গেল প্রচুর গয়না, দুষ্প্রাপ্য এবং অতি দামি দামি হীরে জহরত। দেখতে দেখতে দীপু নীলের কানে কানে বলল, —কিছু গেঁড়িয়ে দিলে হয়। ট্যাক তো প্রায় গড়ের মাঠ। আর এটা নিশ্চয়ই বলা যায় অ্যাতো সব সম্পদ সোজা রাস্তার নয়। তা চোরের ওপর বাটপাড়ি করাটা কি খুব আনএথিক্যাল হবে?

—তুই একটু চুপ করবি দীপু?

BanglaBook.org

—বেশ করলাম, বলেই ও সিগারেট ধরিয়ে ফেলল।

বিছানা ওলটপালট করে বা খাটের সম্ভাব্য লুকনো জায়গাগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করেও তেমন কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু বড়ো অপ্রত্যাশিত কিছু জিনিষ পাওয়া গেল মিররটপ্ কাঠের ক্যাবিনেটের মধ্যে। এটারও কোন চাবি ছিল না। ডালা টানতেই বেরিয়ে এলো কিছু সরকারি স্ট্যাম্প পেপার, বেশ গোছাখানেক। দেখতে দেখতে নীলের চোখ প্রায় ছানাবড়া হবার জোগাড়। কিছু হ্যান্ডনোট, কিছু ধার কবুল করার আইনি স্বীকারোক্তি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক রজতশীর্ষের কাছে বেশ মোটা অংকের টাকা ধার নিয়েছে। কোর্ট পেপারে সাক্ষীর সই সমেত গ্রহিতার কবুলতনামা। কারো কাছে এক লক্ষ, কারো কাছে পাঁচ লক্ষ, কারো কাছে গোটা একটা বাড়ি মর্টগেজ রাখার দলিল। যেগুলোর আপাত হিসেব প্রায় পঞ্চাশ ষাট লক্ষ টাকা, অবশ্যই নিজের ফ্ল্যাটটি বাদ।

—গুরু, এতো তো কুবেরের সম্পত্তি। মাল সুবিধের লোক মনে হচ্ছে না।

দীপুর কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীল জগৎপ্রিয়কে জিগ্যেস করল, —আপনারা এ ঘর তেমন ভাবে তল্লাশি করেননি, তাই না?

—সত্যিই তেমনভাবে করা হয়নি। ক্ষণপ্রভা দেবীর মিসহ্যাপের ঘটনাটা জানার পর লোকাল থানা ইনভেস্টিগেট করা শুরু করে। ততক্ষণ পর্যন্ত জি আর পি থেকে রজতবাবুর পি. এম রিপোর্ট আসেনি। আমরা একদিনই এসেছিলাম। ওপর ওপর যতটা দেখার, দেখেছি, সিজার লীস্টও তৈরি করেছি। তবে যা দুর্গন্ধ, স্পীক ইউ ফ্রাঙ্কলী, আমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। এবার হয়তো ভালোভাবে তদন্ত হবে। কিন্তু বড়বাবুর কথা তো শুনলেন। উনি পলিটিক্যাল হ্যাজার্ডস নিয়ে এমন জড়িয়ে আছেন, এদিকটা আর তেমনভাবে দেখা হয়নি। আপনি এসেছেন। এবার হবে।

—রজতশীর্ষবাবুর অফিসে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল?

—না। এখনও হয়নি। আসলে এ কেসটায় কারো কোন ক্লেইম নেই। আত্মীয়স্বজন, কারো কোন অভিযোগ নেই। কেমন একটা গা ছাড়া ভাব। কেবল কাগজে দিন দুয়েক নিউজটা ছিল। ব্যস্। আপনি এসেছেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। দেখুন যদি কিছু বের হয়।

—মিসেস নন্দী তো সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ ছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ শুনেছি সৃজনমায়া-র ডান্স এবং ড্রামার উনি একজন বিশেষ সদস্যা। ওনার কালচারাল পারফরমেন্স বেশ উল্লেখযোগ্য। ছোটখাটো সেলিব্রিটি বলা যায়।

—ঠিক আছে। মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া গেল। আচ্ছা সামনের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা, এ বাড়িতে আরো একজনের নিয়মিত আসার কথা বলেছিলেন তাই তো?

—হ্যাঁ, লোকটার নাম নাকি বিশ্বদীপ। পদবি জানি না।

—তিনি কি এর মধ্যে আর এসেছিলেন?

—নাহ্, মিসহ্যাপের ঘটনার দিন থেকে সে ভদ্রলোকও আর আসছেন না।

—অর্থাৎ তিনি জানেন এই দুর্ঘটনার কথা।

—জানতে পারেন। কাগজে তো ঘটনাটা বেরিয়েছে।

—কোন রাজনৈতিক দল এদের বডি দেখে কোন ক্লেইম ট্লেইম করেনি।

—না। তেমন কোন রিপোর্ট পাইনি। তাহলে তো অ্যাদ্দিনে হইচই পড়ে যেতো। পোস্টার, বন্ধ, কিছুই বাদ যেতো না। চালিয়ে দিতো প্রশাসনিক গাফিলতা বলে।

—তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি কোন পলিটিক্যাল লেভেলে এদের কোন যোগাযোগ ছিল না?

—আমাদের থানায় কোন রিপোর্ট নেই এটুকু বলতে পারি।

—তার মানে দুজন বিত্তবান মানুষের মৃত্যু নিয়ে কারো কোন ঔৎসুক্য নেই?

—এটা হোতে পারে। অধিকাংশই সংসারী মানুষ। নিজের গরজে থানায় এসে অভিযোগ লিখিয়ে তার পেছনে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে হয়তো কারও ছিল না বা নেই। সেই জন্যেই তো আমাদের ওসি সাহেব খুব একটা গা ঘামাচ্ছেন না।

—ঠিক আছে, একটা জিনিস আমাদের খুঁজে পাওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল।

—কি?

—একটা ডায়রি অথবা ডিজিট্যাল নোটবুক। লোকটা কেন মারা গেছে এবং তার স্ত্রী কেন খুন হয়েছেন সেটা জানতে গেলে একটা ডায়রি জাতীয় কিছু পাওয়া খুব দরকার ছিল।

—ডায়রি পাওয়া যাবে কিনা জানি না, তবে খাটের ওপর সেদিন একটা ডিজিটাল ডায়রি পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ কিছু ছিল না। কিছু লোকের নাম, ঠিকানা আর ফোন নাম্বার। কিন্তু তা দিয়ে কি কিছু পাওয়া যাবে?

—সেটা কি এখন আপনাদের হেফাজতে?

—হ্যাঁ।

—ওটা একবার দেখার দরকার।

BOIRBOI.NET

—খুব কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। শুধু নাম আর ফোন নাম্বার। তবে আপনি দেখতে চাইলে সত্যশোভনদা না করবেন না।

—ঠিক আছে চলুন। ঘরটাকে ভালো করে সিল করবেন। আর কোনদিন কেউ যদি ক্লেইম নিয়ে আসে তাকে কোন মতেই হাতছাড়া করবেন না। আসলে আমাদের এখন দরকার এই দুজনের কোন কমন ফ্রেণ্ডকে। সেই হিসেবে মনে হয় বিশ্বদীপবাবু খুব ওয়ান্টেড পার্সন।

ঘরটি ভালোভাবে তালা লাগিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটে খোঁজ নিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল না। আসলে খুনের ব্যাপারে কেউই আর স্বতঃস্ফূর্ত মতামত বা তাদের আইডিয়া ব্যক্ত করে না। সম্ভবত ফেঁসে যাবার ভয়ে। এমন কী মিসেস ঊর্মিলা ভট্টাচার্যকেও সেদিন উঁকি দিতে দেখা গেল না। হৃদয়হরণবাবুকেও না।

১০

শ্যামচাঁদ কিছুতেই ছাড়ল না। ও তক্কে তক্কে ছিল। যতক্ষণ নীল আর দীপু ইনভেস্টিগেশন নিয়ে ব্যস্ত ছিল ওর টিকিরও দেখা পাওয়া যায়নি। 'আশ্রয় আবাসন' থেকে বেরবার পর জগৎপ্রিয় থানায় ফিরে গেল। যাবার সময় ও অবশ্য বলেছিল থানায় গিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে। কিন্তু নীল বা দীপু রাজি হয়নি। এসব ব্যাপারে নীল অত্যন্ত নিয়মমানা ছেলে। প্র্যাকটিক্যালি কেসটার মধ্যে ও বেশ জটিলতার সন্ধান পেয়ে নিজের গরজেই এসেছে। অবশ্য শ্যামচাঁদের একটা প্রচ্ছন্ন উৎসাহ ছিলই। শ্যামচাঁদ দীপুর বন্ধু। নীলের জন্যেই দীপু বর্তমানে একটা সামাজিক আইডেন্টিটি পেয়েছে। শ্যামচাঁদও দীপুর সঙ্গে দলছুট হবার পর মরিয়া হয়ে লেদ কারখানায় কাজ শিখতে ঢুকে যায়। বর্তমানে বিয়েটিয়ে করে ভালই আছে। একটা প্রায় বকে যাওয়া ছেলের মনে বড়পুকুর থানার আণ্ডারে দুটো অস্বাভাবিক মৃত্যু ওকে নাড়া দিয়েছে এবং সে দীপুর শরণাপন্ন হয়েছে। নীলও 'নেই কাজ তো খই ভাজ' এমনি একটা মনোভাব নিয়ে বড়পুকুর থানায় এসেছে। আর তদন্ত করতে নেমে ওর মনে হোল অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। তাই আর ও সময় নষ্ট করতে চাইছিল না। জগৎপ্রিয় ফিরে যাবার পর নীলের ভাবান্তর দেখে দীপুই বলল, —গুরু, আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি একটা হেস্তনেস্ত চাইছ। ভালো কথা, কিন্তু এখন তো পেটের মধ্যে একটা ক্ষুধার্ত জন্তু, সেও কিছু হেস্তনেস্ত চাইছে। এখানে কোন পাইস হোটেলটোটেল দেখলে হোত।

—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। চ, একটু খুঁজেটুঁজে দেখি।

খুঁজতে হোল না। কোথায় যে ছিল শ্যামচাঁদ। দুম্ করে সামনে এসে হাজির। একগাল হেসে নীলের উদ্দেশ্যে বলল,—দাদা, আমার পাগলামির জন্যে আপনাদের হয়রানি। তার কিছুটা উশুল হোত, মানে আমার খিঁচ্‌খিঁচ্ করা মনটা একটু স্বস্তি পেতো, যদি আমার গরীবখানায় আপনি যেতেন।

হাত তুলে ওকে থামিয়ে নীল বলল,—এখানে গরীব বড়লোকের কোন ব্যাপার হচ্ছে না। তোমার যদি অসুবিধা না হয় তাহলে তোমাদের বাড়ি যেতে আমার আপত্তি নেই। সত্যিই আমাদের খুব খিদে পেয়েছে।

—আমাকে আর লজ্জায় ফেলবেন না দাদা। চলুন আমার বাড়িতে। আমার বউয়ের রান্নার হাতটা ভাল। আপনার বউমা অনেক করে বলে দিয়েছে যেন আপনাদের দুজনকে পাকড়াও করে নিয়ে যাই। নইলে ও বেচারি মনে খুব কষ্ট পাবে।

দীপু বলল,—কাউকে অকারণে কষ্ট দেওয়া আমাদের মটো হওয়া উচিত নয়, কি বলো নীলদা?

নীল হেসে ফেলে, তারপর বলে,—বুঝেছি। চল শ্যামচাঁদ। তোমার বাড়িতেই ঢোকা যাক। তবে আমরা কিন্তু খেয়েদেয়েই পালাব। আচ্ছা শ্যামচাঁদ তুমি কি বলতে পারবে, সৃজনমায়ার ঠিকানাটা কোথায়?

শ্যামচাঁদ বলে,—আমি চিনি দাদা। আপনাকে নিয়ে যাব। তবে সন্ধের আগে ওদের ক্লাবরুমে বড়ো একটা কেউ আসে না। ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আপনাকে মিনিমাম সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

—ঠিক আছে শ্যামচাঁদ, এবার দীপুই বলল, তুই আর এসব নিয়ে ভাবিস না। চল তোর বউয়ের হাতে উত্তম অন্নব্যঞ্জনাদি কিছু খেয়ে নিয়ে বিকেল নাগাদ আমরা বেরুব।

স্বপ্না মেয়েটা বেশ হাসিখুশি আর উচ্ছল প্রকৃতির। শ্যামচাঁদ স্কুল- ফাইন্যালে বার তিনেক গাড্ডা খাবার পর পড়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু স্বপ্না বি.এ.পাস। তাছাড়া মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। শ্যামচাঁদের সঙ্গে স্বপ্নার আলাপ হয়েছিল স্বপ্নার বড়দির বিয়েবাড়িতে। আসলে স্বপ্নার পিসতুতো দাদার সঙ্গে শ্যামচাঁদের দোস্তি ছিল। সেই সুবাদেই স্বপ্নার বাড়ি নিমন্ত্রণ। আর সেখানেই চার চোখের মিলন খেলা। আর সেই খেলাটারই পরিণতি পরিণয়ে। যেটা অনেকের কাছেই বিস্ময়। যদিও এ কাহিনীতে শ্যামচাঁদ তেমন উল্লেখযোগ্য চরিত্র নয়। আবার হ্যাঁও বটে। সেই প্রথম দেহ আবিষ্কার করে। পুলিসে এফ আই আরও করে। এবং শেষ পর্যন্ত নীল

আর দীপুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে টেনেও নিয়ে এসেছে।

স্বপ্নার বাড়িতে শেষ পর্যন্ত শ্যামচাঁদের একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। কারণ শ্যামচাঁদের বাবা মারা যাওয়া এবং বোনের বিয়ে হয়ে যাবার পর সে ছিল একা। স্বপ্নার নিজের দাদা দিদি কেউ নেই, সেই তার বাবা-মার একমাত্র মেয়ে। তারপর কিছু টানাপোড়েনের পর স্বপ্নার সঙ্গে শ্যামচাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। এবং সেই থেকে পার্মানেন্ট ঘরজামাই।

স্বপ্নাই পরামর্শটা দেয়। তারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে শ্যামচাঁদ ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতো দীপুর মাধ্যমে নীলকে ডেকে এনেছে। এমন অতিথির জন্যে অনেক কিছুই করা যায়। স্বপ্নার হাতের রান্না খেতে খেতে নীল বেশ তারিফ শুরু করে বলল,—বুঝলে শ্যামচাঁদ, একটা দিকে তুমি খুবই ভাগ্যবান। তোমার বউটিকে নিয়ে যদি একটা খাবারের দোকান খোলা যায়, আর তোমার লেদ কোম্পানি যদি উঠেও যায় তা সত্ত্বেও তোমার খাবার অসুবিধা হবে না। আমরা তোমায় গ্যারান্টি দিতে পারি, তোমার গৃহিণীর রান্নার হাত যে এতো সরেস তা আমার ধারণায় ছিল না।

প্রশস্তিতে পুলকিত হয় না এমন মেয়ের সংখ্যা খুবই কম। মুখে লজ্জা আর অন্তরে বেশ ভালো লাগার গর্বটুকু ভোগ করতে করতে স্বপ্না বলল,—জানেন দাদা, আমরা তো ওপার বাংলার মেয়ে। আমার মা দিদিমার কাছে রান্না শেখা। সবাই ভালো বলে। সবাই আমার রান্না খেয়ে তারিফ করে। সেটাই আমার অনেক পাওয়া। এই যে আপনি তৃপ্তি করে খেলেন, আমার খুব ভালো লাগছে। তবে ঐ যে বললেন একটা দোকান খুলে বসা, সেটা বোধহয় বাস্তবে সম্ভব হবে না। তাছাড়া শ্যামতো আর অথর্ব হয়ে যায়নি। শুনেছিলাম ও নাকি একদিন দীপুদার সাগরেদ ছিল।

দীপু খাওয়ার সময় বেশ মন দিয়ে পর্বটি শেষ করে। এতোক্ষণ ও কোন কথাই বলছিল না। স্বপ্না ওর প্রসঙ্গ টানতেই দীপু বলল,—বুঝলে বউঠান, সব মানুষেরই জীবনে ব্যাডপ্যাচ আসে। যেমন খেলোয়াড়দের আসে। আমাদেরও এসেছিল। আসলে তখন আমাদের জীবনে কোন লক্ষ্য ছিল না। তারপর একদিন নীলদাই আমাকে রাস্তা দেখায়, আমিও দল ছাড়লাম। অন্যরাও একে একে নিজের পথ বেছে নিল। তবে বউঠান শ্যামচাঁদই বোধহয় সব থেকে বেটার আছে। কারণ বেটা গোমূর্খ তোমার মতো একজন মহিলাকে জীবনে পেয়ে গেছে। আমি যতদূর জানি তুমি না থাকলে ও শালা লেদের মিস্তিরি হোত, তারপর মোদোমাতাল হয়ে কোথাও ভেসে যেতো।

অন্য প্রসঙ্গে মোড় ঘোরালো নীল,—ঠিক আছে, এখন আর ওসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। পাস্ট ইজ পাস্ট। আর পাস্টটাই সব নয়। এবার যে কারণে এখানে আসা সে সম্বন্ধে তোমাদের দুচারটে কথা জিগ্যেস করি। আচ্ছা স্বপ্না, তোমার মাথায় হঠাৎ কেন স্ট্রাইক করল, যে আমাকে এই ইনসিডেন্টের ব্যাপারটা জানানোর দরকার আছে। তোমার কি ব্যাপারটাকে অ্যাবনরম্যাল মনে হয়েছিল?

স্বপ্না সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল,—হ্যাঁ দাদা, ঠিক তাই। রেল লাইনে গলা দিয়েছে, কী রেলের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এমন ঘটনা তো বিস্তর ঘটে। শ্যাম যখন আমায় এসে সব কিছু বলল তখনও আমি তেমন কিছু মনে করিনি। কিন্তু পুলিস যখন খোঁজখবর নিয়ে জানলো ঐ একই দিনে ঐ লোকটির স্ত্রীকে কেউ খুন করেছে এবং তার ঘরে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তখনই কিন্তু ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে যায়। আমার মনে হয় এর মধ্যে কোন গভীর রহস্য আছে।

—রহস্যটা কী?

—তা তো দাদা বলতে পারব না। সেটা আপনার মতো মানুষই খুঁজে বার করতে পারবেন। আসলে কি জানেন, দুটো ব্যাপার আমি মেলাতে পাচ্ছি না। বউটাকে যদি ওর হাজব্যাণ্ড খুন করে থাকে, নিশ্চয়ই কোন একটা কারণে করেছে। কী কারণ সেটা আমার পক্ষে জানা তো সম্ভব নয়। বলতেও পারব না। এখন কথা হচ্ছে, হয় ওর হাজব্যাণ্ড বা অন্য কেউ মেয়েটাকে খুন করেছে। যদি সত্যিই ওর স্বামী ওকে খুন করে থাকে, তাহলে সে আবার রেলের নীচে গলা বাড়িয়ে দেবে কেন? সেটা কী স্ত্রীকে খুন করার পর অনুশোচনায়? আর যদি জানা যায় লোকটাকেও কেউ খুন করে রেললাইনে শুইয়ে দিয়ে গেছে তাহলে সেটা কেন? কী জন্যে?

দীপু অবাক হোয়ে খানিকক্ষণ স্বপ্নার কথা শুনল। তারপর বলল,—নীলদা, এক কাজ করো শ্যামের বউটাকে তুমি আমার মতো আর একজন সাগরেদ বানিয়ে নাও। এখন তো অনেক মেয়ে গোয়েন্দা দেখা যাচ্ছে। ও যেভাবে একের পর এক ঘটনার বিশ্লেষণ করছে, দুঁদে গোয়েন্দার মতো, শ্যাম বউয়ের হাতের রান্না তোর কিছুদিনের মধ্যেই ঘুচবে বলে মনে হচ্ছে।

বাধা দিয়ে স্বপ্না বলল,—দীপুদা, তুমি বড়ো বাজে বকো। আমার মনের এই প্রশ্নগুলো বড়পুকুর এলাকার সব মানুষের মনের কোয়্যারিজ। তারা তো আর কেউ নীল ব্যানার্জীকে চেনে না, চিনলে ওনাকে আমার মতো করেই ডেকে

আনতো, আর যা যা প্রশ্ন আমি করেছি সেইগুলোই উগরে দিতো। যাকগে, নীলাঞ্জনদা আপনাকে আমার অনুরোধ, যদি আপনার সময় থাকে, উপযাচক হয়ে বলছি, আসল সত্যিটা আপনি খুঁজে বার করুন।

—এতে কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত কোন লাভ নেই।

—আছে, শ্যামের মতোই আমার মনের কিছু জিজ্ঞাসার উত্তরটা পেয়ে যেতে পারি।

—বুঝলাম, নীল সিগারেট ধরায়। কিছু সময় নিয়ে নিজের মনেই কিছু ভাবতে থাকে।

তারপর বলে,—শ্যামচাঁদ, আজ আমার দুপুরটা এখানে থেকে যাবার একটাই কারণ, তোমাদের এখানে 'সৃজনমায়া' নামে যে কালচারাল ক্লাব আছে তাদের সঙ্গে মিট করা। তুমি তো চেনো বললে?

—হ্যাঁ দাদা, কখন যাবেন বলুন?

—এখন তো গিয়ে কোন লাভ হবে না। সন্ধ্যে নাগাদ। তোমাদের কোন প্রোগ্রাম নেই তো! আজ কিন্তু রোববার।

—থাকলেও বাদ দিতাম। আপনি কত কষ্ট করে কলকাতা থেকে এলেন। সারাদিন এখানে থাকলেন। আর আমি, স্বপ্না তুমি দাদার একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। বিকেলে চা-টা খেয়ে আমরা বেরবো।

ঠিক সন্ধ্যের মুখে মুখে 'সৃজনমায়ায়' গিয়ে পৌঁছল ওরা। সম্ভবত কোন নাটকের রিহার্সাল চলছিল। ওরা গিয়ে দাঁড়াতেই একজন মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়ালেন, —আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন?

শ্যামচাঁদ লোকাল ছেলে। ওই এগিয়ে গিয়ে বলল,—ওনারা একটু আপনাদের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে চান।

—আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

এবার নীলই এগিয়ে গিয়ে বলল, —সেটা ঠিক এক কথায় বোঝানো যাবে না। আপনিই কি সেক্রেটারি?

—না, আমাদের সেক্রেটারি হচ্ছেন পরেশদা। মানে পরেশ ধর। উনি পাশের ঘরে আছেন। সামনের শোয়ের খরচটরচ নিয়ে আলোচনা করছেন মিতাদির সঙ্গে।

—দেখা করা যাবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। চলুন।

ভদ্রলোক ওদের নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। সেখানে চেয়ার টেবিলে বসে এক মহিলা আর এক ভদ্রলোকটি কথা বলছিলেন। সঙ্গের ভদ্রলোকটি ওদের উদ্দেশ্যে বললেন,—পরেশদা, এঁরা আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান।

পরেশদা নামের ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন। বছর পঞ্চাশের মতো বয়েস। একমাথা টাক। গায়ের রঙটা বেশ টকটকে। বোধহয় খুব সিরিয়াস কোন হিসেবনিকেশে ব্যস্ত ছিলেন। ভ্রূ সামান্য তুললেন, বললেন,—আমার সঙ্গে? বেশ তো বলুন কি বলবেন? কিন্তু আপনারা কারা?

সামনে আরও কয়েকটা চেয়ার ছিল। ওরা তিনজন গিয়ে বসল। নীল ওর আইডেন্টিটি কার্ডটা এগিয়ে দেয়। মুখস্ত করার ভঙ্গিতে কার্ডটা দেখতে দেখতে বললেন,—আপনি একজন গোয়েন্দা। বেশ তো বলুন কি বলতে চান?

নীল শুরু করল,—একটা ইনফরমেশনের জন্যে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে।

—ইনফরমেশন? বুঝতে পারছি, ক্ষণপ্রভা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইবেন?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। ক্ষণপ্রভা নন্দী সম্ভবত আপনাদের সভ্যা ছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ ছিলেন। কিন্তু তিনি তো,—

—সেই কারণেই আমার আসা, আমার ভিজিটিং কার্ডটাও তাই বলছে।

—আই সি। আপনি যখন গোয়েন্দা। নিশ্চয় পুলিসের লোক?

—না, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। প্রয়োজনে পুলিসের সাহায্য নিই। তবে তাদের কাজের ধারা আলাদা।

—কিন্তু পুলিস এসে একবার তো খোঁজখবর নিয়ে গেছে।

—ওই যে বললাম, আমি পুলিস নই। ব্যক্তিগত ভাবে আমি কেসটার তদন্ত করছি। এবার বলুন মহিলা আপনাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাই না?

—হ্যাঁ, ওনার ডিমাইজটা আমাদের কাছে গ্রেট লস্। ওঁর জায়গাটা আর পূর্ণ হবে না। কি মিতা, তুমি কি বল?

সামনে বসা মহিলাটি এতোক্ষণ কাগজের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। পরেশবাবুর প্রশ্নে মুখ তুলে বললেন,—হ্যাঁ। এখনও আমরা ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না। উনি একাই আমাদের মাতিয়ে রাখতেন। সব দিক দিয়েই উনি ছিলেন আমাদের ইনস্পিরেশন।

—সব দিক বলতে, নীল প্রশ্ন করে।

কথা কেড়ে নিয়ে পরেশবাবু বললেন,—একাই একশো বলে একটা কথা আছে। উনি ছিলেন তাই। যেমন ওনার রূপ, তেমনি গানের গলা, তেমনি ভালো নাচতেন। আর অভিনয়, ডিরেকশান সবেতেই ওনার অবদান ভোলার নয়। তাছাড়া—

—তাছাড়া?

—আমাদের 'সৃজনমায়া' নতুন করে বেঁচে উঠেছিল বা এখনও বেঁচে আছে ওনারই আর্থিক আনুকূল্যে। ক্লাবের জন্যে উনি অলরেডি লাখ দুয়েক টাকা ইনভেস্ট্ করেছেন। যেটা আট মাস আগেও একটা স্বপ্ন ছিল।

—ইনভেস্ট্ বলছেন কেন?

—আসলে উনি চেয়েছিলেন 'সৃজনমায়া'কে প্রফেশনালর লেভেলে নিয়ে যেতে। অ্যামেচারিস্ট ব্যাপারটাকেই উনি বিশ্বাস করতেন না। উনি মনে করতেন টাকা ঢাললে টাকা আসে। আর আমরাও আমাদের আউটলুক পাল্টেছিলাম। এগোচ্ছিলাম প্রফেশনাল স্পীডে।

—অর্থাৎ উনি ছিলেন প্রোডিউসার?

—বলতে পারেন।

—মাফ করবেন, মিতা দাসের দিকে তাকিয়ে নীল বলল, আপনি তো প্রায়ই ক্ষণপ্রভাদেবীর বাড়ি যেতেন।

মিতা চোখ সরু করে নীলের দিকে তাকিয়ে বলল,—আপনি জানলেন কি করে?

—জানাটাই তো আমাদের কাজ। তাই না? এখন বলুন, যেতেন কিনা?

—হ্যাঁ, যেতাম।

—তাহলে তো কিছু খবর দিতে পারবেন। যদিও ব্যাপারটা ব্যক্তিগত তবু প্রশ্নটা করতে হচ্ছে, এই যে উনি এতো টাকা ইনভেস্ট্ করেছিলেন, পেতেন কোথায়?

—ক্ষণপ্রভাদির, মুখেই শুনেছি, আগে একটা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতেন। অনেক টাকা মাইনেও পেতেন। তারপর স্কুল ছেড়ে দিয়ে নাচ গান অভিনয়ের দিকে চলে যান। এবং নামটামও করেন। ভালো টাকাও রোজগার করতেন। এছাড়া সংসার খরচ করতেন ওনার স্বামী। ন্যাচার‍্যালি ওনার রোজগার সবটাই বেঁচে যেতো।

—রজতশীর্ষবাবু তো ব্যাঙ্কের অফিসার ছিলেন?

—ঠিকই শুনেছেন, দুজনের রোজগার মিলিয়ে অ্যামাউন্টটা বেশ ফেবুলাস।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল,—উনি মার্ডার হয়েছেন এটা নিশ্চয়ই শুনেছেন?

—সেটাই আমাদের কাছে বিস্ময়। ওর মতো মহিলাকে কেউ ওই ভাবে খুন করতে পারে ভাবা যায় না।

—ওনার কি কোন ব্যক্তিগত শত্রু ছিল?

পরেশবাবু এতোক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার বললেন,—ব্যক্তিগত শত্রু বলে আপনি কি বলতে চাইছেন?

—মানে, প্রফেশনাল জেলাসি থেকে কেউ খুন করতে পারে। অথবা উনি ওনার অজান্তে কারো ক্ষতি করে ফেলেছিলেন।

মাথা নাড়তে নাড়তে পরেশবাবু বললেন,—ক্ষণপ্রভার ব্যক্তিগত জীবন মানে ও আর ওর স্বামী। আমরা যতদূর জানি ওদের মধ্যে কোন ভাবভালবাসার খামতি ছিল না। ওর স্বামী রজতশীর্ষবাবুও আমাদের ক্লাবের বড় প্যাট্রন ছিলেন। ওঁর কাছ থেকেও আমরা নানাভাবে সাহায্য পেতাম। নগদ টাকা। বিজ্ঞাপন।

—আমি শত্রুতার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।

—নাহ্! অন্তত 'সৃজনমায়া'র কারো সঙ্গেই ক্ষণপ্রভার কোন শত্রুতা ছিল না। সবাই প্রভাদির সুইট পার্সোন্যালিতে বলতে পারেন মজে ছিল। প্রফেশনাল জেলাসির প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এখানে কেউই সমকক্ষ নয়।

—ওনার কোন লাভ অ্যাফেয়ার্স? আই মিন এমন কিছু শুনেছেন কি?

—আমাদের জানা নেই। আর বললাম তো রজতশীর্ষর সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল।

—রজতশীর্ষবাবু ঐ একই রাত্রে সুইসাইড করেছিলেন, নিশ্চয়ই জানেন।

—আমার কাছে সেটা খুবই ন্যাচারাল বলে মনে হয়েছে।

—কী রকম?

—ক্ষণপ্রভার মৃত্যুটা সহ্য করতে না পেরে সুইসাইড করাটা রজতবাবুর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

অ্যাশট্রের মধ্যে সিগারেটের বাকি অংশটা গুঁজে দিতে দিতে নীল বলল,—বিশ্বদীপ বলে কাউকে আপনারা চেনেন?

হঠাৎ পরেশবাবু যেন ক্ষেপে গেলেন,—একেবারে লক্কড়মার্কা লোক মশাই। দুশ্চরিত্র, লম্পট। ওর জন্যেই তো

—আঃ পরেশদা, যেন ধমক দিয়ে উঠলেন মিতা দেবী।

পরেশবাবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,—দেখুন নীলাঞ্জনবাবু, বিশ্বদীপ ঘোষ আমাদের ক্লাবে আসতো বটে, ক্ষণপ্রভার সঙ্গেই আসতো, এর বেশি আমরা তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

—আচ্ছা, ওনার পদবি তাহলে ঘোষ। কিন্তু, পুলিসের কাছে আপনারা জানিয়েছিলেন বিশ্বদীপ ঘোষ বলে আপনারা কাউকে চেনেন না। এমন কি কোনদিন চোখেও দেখেননি। তাহলে কোন্‌টা ঠিক বলে ধরে নেবো?

কিছু উত্তর দেবার আগেই মিতা বলে উঠলেন,—এক অর্থে সেটাই ঠিক কথা। ক্লাবের অনেকেই বিশ্বদীপবাবুকে চেনে না। মাত্র দু-এক দিনই উনি এসেছিলেন। হয়তো পুলিস যখন জিজ্ঞাসাবাদে আসে তখন যে ছিল সে হয়তো বিশ্বদীপবাবুকে চিনতো না।

দুম করে নীল উঠে দাঁড়াল। তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার মিতা আর একবার পরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল,—আপনারা বলতে চাননা বিশ্বদীপবাবুর সঠিক পরিচয়টা কি? পরিচয়টা জানালে ভালো করতেন। কারণ ক্ষণপ্রভা দেবীর খুন আর রজতশীর্ষবাবুর হত্যা অথবা আত্মহত্যা, এ দুটোর সঙ্গে বিশ্বদীপবাবুর একটা যোগসূত্র আমাদের চোখে পড়ছে। ঠিক আছে, আমার কার্ড আপনাদের কাছে রইল। বিশ্বদীপবাবু সম্পর্কে কোন ইনফরমেশন থাকলে আমাকে জানাবেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে দীপু বলল,—কিন্তু বিশ্বদীপ লোকটাকে কোথায় খুঁজে পাবে? কেউই তো মুখ খুলছে না। না এরা না ওরা। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলে তো, বিশ্বদীপ প্রসঙ্গ উঠতেই মিতা দেবী কিরকম ধমকে দিলেন পরেশবাবুকে।

—হ্যাঁ, জানি। ওরা দুজনেই জানে বিশ্বদীপ সম্পর্কে। কিন্তু বেশি আপত্তি মিতাদেবীর।

কেন? বিশ্বদীপকে মিতা আড়াল করতে চাইছে? কিন্তু কেন?

এই প্রথম শ্যামচাঁদ কথা বলল,—মিতার পেছনে ফেউ লাগাব?

—কী রকম, হাঁটতে হাঁটতেই নীল বলল।

—এখানে আমার অনেক ছোটখাটো মাস্তানের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাদের একজনকে,

দীপু একবার শ্যামচাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, —তুই এখনো মাস্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিস? সময় পাস?

—আরে বাবা, মাস্তানদের সঙ্গে আলাপ থাকা আর মাস্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এক জিনিস নয়। স্বপ্না জানতে পারলে আমায় বাড়ি থেকে বার

করে দেবে। আসলে সবার সঙ্গেই ভাবটাব রাখতে হয়। কখন কাকে কি দরকার পড়ে। আপনি কি বলেন নীলদা?

—ইউ আর রাইট। মৌখিক ভাবটাব সবার সঙ্গেই রাখা উচিত। ফেউ লাগাতে পার। অথবা 'সৃজনমায়া'য় কোন সভ্যকে টোকা দিয়ে দেখতে পার। আমার দরকার মিতাকে নয়, বিশ্বদীপ ঘোষকে। লোকটাকে পাওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। হয়তো এ রহস্যের চাবিকাঠিটা ওখানেই।

পায়ে পায়ে ওরা স্টেশনের কাছে চলে এসেছিল। দুখানা টিকিট কেটে নীল বলল,—শ্যামচাঁদ, তোমাকে আর অপেক্ষা করতে হবেনা। বাড়িতে স্বপ্না একা আছে। তুমি এসো। বউকে বোল আবার যখন আসব চা-টা তোমার ওখানেই খাব।

—ঠিক আছে দাদা, বলে শ্যামচাঁদ হাসতে হাসতে চলে গেল।

দীপু বলল,—শ্যামচাঁদকে কাটালে কেন বল তো? এনি মতলব?

—নো মতলব। বিয়ে তো করিসনি। বেচারি সপ্তাহে একদিন ছুটি পায়। এই ছুটির অর্থ তোর মাথায় ঢুকবে না।

দীপু আড়চোখে নীলকে দেখে নিয়ে বলল,—চালুনি ছুঁচকে বলে তোর ইয়েতে কেন ফুটো? পঞ্চাশ বছরের আইবুড়ো কার্তিক, তার কাছে শুনতে হবে বিয়ের কেত্তন। ভাল্লাগে না বাবা!

১১

স্টেট ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখায় নীল আর দীপু যখন পৌঁছল তখন বেশ পিকআওয়ার। যদিও ইদানীং ভি আরেসের দৌলতে লোকজন কমতে কমতে মন থেকে ছটাকে এসে দাঁড়িয়েছে। কতিপয় লোক কমপিউটার সামনে রেখে মাউস ক্লিক করে যাচ্ছে। স্টাফ কম থাকলেও অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের সংখ্যা খুব খারাপ ছিল না। বেশির ভাগই ব্যবসাদার আর দোকানদার। বাঙালির থেকে অবাঙালির সংখ্যাই বেশি। নীল সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করল। সুদৃশ্য চেম্বার। ম্যানেজারের নাম সঞ্জয় দত্ত। দীপুর নিজের স্বভাব অনুযায়ী ফুট্ কাটলো,—মুম্বাইয়ের ফিল্ম্ বাজার কি শুয়ে পড়েছে?

—কেন? হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—সঞ্জয় দত্ত সিনেমা ছেড়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হয়েছে, ভাবা যায়?

—ভেতরে ঢুকে আবার ফোকরি করিস না যেন।

—আদমি না আণ্ডা? ও তুমি কিছু ভেবো না।

BanglaBook.org

সঞ্জয় দত্ত একাই ছিলেন। নামের কেতা থাকলেও ভদ্রলোকের চেহারায় কোন পালিশ ছিল না। নেহাতই সাদামাটা। তায় এক মুখ পান। নীল আর দীপু ঘরে ঢুকতেই উনি সামনের দুটো চেয়ারে বসতে বললেন।

—আপনারা একটা কার্ড পাঠিয়েছেন। মিস্টার নীলাঞ্জন ব্যানার্জি। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। নাও, হু ইজ মিস্টার ব্যানার্জি?

নীল বলল,—আমিই।

—কিন্তু প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কেন আসবেন আমার ব্যাঙ্কে এটাই বুঝতে পারছি না।

—দরকারে তো আমাদের ভাগাড়ে বা গোরস্থানেও যেতে হয়।

—আই সি। নাউ টেল মি হোয়াট ইজ ইয়োর প্রবলেম?

—আপনাদের ব্রাঞ্চে রজতশীর্ষ নন্দী নামে কেউ ছিলেন?

—হ্যাঁ ছিলেন। বাট অ্যাট প্রেজেন্ট হি ইজ ডেড। হি কমিটেড সুইসাইড।

—আমরা সেটা জানি। তা উনি কি সুইসাইড করতে পারেন?

—উনি যে কি পারতেন আর পারতেন না সেটাই আমাদের কাছে বিস্ময়।

—আপনার একথার অর্থ?

সঞ্জয় দত্ত নিজের একটা সিগারেট ধরালেন। নীল এবং দীপুর দিকে এগিয়ে ধরলেন। নীল যথারীতি 'নো থ্যাঙ্কস্' বলে নিজের ব্রাণ্ড বার করল। তবে দীপু, আগ্রাসী হাত বাড়িয়ে একটা তুলে নিল। সিগারেট ধরিয়ে সঞ্জয় দত্ত বললেন, —রজতশীর্ষ এই ব্র্যাঞ্চে চাকরি করতেন এটা আপনারা যে করেই হোক জেনেছেন, বাট ইউ ডিডনট্ নো, ওনার চাকরিটি আর ছিল না।

—মানে?

—কোনো ব্যাঙ্ক অফিসার যদি ব্যাঙ্কের টাকা নয়ছয় করেন তার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, তাহলে কী তার চাকরি থাকে?

—নয়ছয়ের ব্যাপারটা কি?

—উনি ছিলেন লোন স্যাংশন্ড অফিসার। কোনো পার্টিকে লোন দেওয়া হবে কি হবে না সেটা ওর ওপর নির্ভর করতো। আর এই লোভনীয় সিটের দৌলতে উনি পুকুর চুরি করেছেন। এবং ধরাও পড়েছেন। ফলে—

—কিন্তু ব্যাঙ্কের সবকিছুই তো একটা টোট্যাল মেসিন্যারি। তাহলে?

—আপনি কি রজতশীর্ষকে চিনতেন?

—না, তবে ওঁর এবং ওঁর স্ত্রীর একই দিনে দুর্ঘটনার জন্যে পুলিসের গায়ে ছ্যাঁকা লেগেছে। পুলিস কেসটার তদন্ত চালাচ্ছে। এবং প্রাইভেটলি আমি।

—সবই ঠিক আছে। তবে নন্দীর যে আলটিমেট এন্ড এটাই হবে সেটা আমরা আঁচ করেছিলাম। বিভিন্ন সময়ে নাম ভাঁড়িয়ে লোককে ঠকিয়ে কাঁদিয়ে কেউ কখনও সুখে থাকতে পারে না।

—একথা কেন বলছেন?

—ব্যাঙ্কে থাকাকালীন উনি যে অপরাধ করেছিলেন তাতে ওঁর চাকরি চলে যেতই।

—অপরাধটা কি?

—অপরাধ কি একটা? অনেক। অথচ উনি এখান থেকে যা মাইনে পেতেন, ফেবুলাস অ্যামাউন্ট। শুনেছি ওনার স্ত্রীও ভালো আর্ন করতেন। বাট, লোভ। কথায় আছে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আগেই বলেছি উনি ছিলেন লোন অফিসার। লোন পাইয়ে দেবার নাম করে দেদার ঘুষ নিতেন। সেটা একদিন ধরা পড়ে যায়। ব্যাঙ্কের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি, সে এক এলাহি ব্যাপার।

—এটা কতদিন আগের কথা?

—তা ধরুন বছর দেড়েক তো হবেই।

—তারপর?

—খুব ধড়িবাজ লোক। ব্যাঙ্ক কোন স্টেপ নেবার আগেই বা নিজের কোন ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে আগে ভাগেই ভি. আর. নিয়ে নেন। পরে আরও অনেক কিছু জানা যায়।

—সেটা কি?

—চিট্। হ্যাঁ সোজা বাংলায় ভদ্রলোক একটি চিটিংবাজ। ইদানীং ভি. আর-এর খুব হিড়িক পড়েছে। ফলে কিছু মানুষের হাতে এককালীন থোক অনেক টাকা এসে যাচ্ছে। তো, কাঁচা টাকা তো লোকে ফেলে রাখে না। হয় কোন চিট্‌ফাণ্ডে নয়তো পোস্টঅফিসে। মানে যেখান থেকে মাস্থলি ইন্টারেস্ট পাওয়া যায়।

—হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের চেহারাটা ওইরকমই।

—এর মধ্যে কিছু কিছু মানুষ আছেন, বিশেষ করে বাঙালিরা, যাঁরা একটা ছোট্ট নিজস্ব ঘরের স্বপ্ন দেখেন। রজতশীর্ষ সেই সুযোগটাই নিয়ে নেন। ওনারশিপ ফ্ল্যাট দেবার নাম করে বহু লোকের বহু টাকা উনি আত্মসাৎ করেছেন। আর একাজে ওঁর ডানহাত ছিল ওঁর এক বন্ধু। অবশ্য তখন আর ব্যাঙ্কের কিছু করার নেই। তার আগেই তো উনি ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে গেছেন।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল—এক্সকিউজ মি, এই বন্ধুটি কে? চেনেন তাকে?

আলতো করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে সঞ্জয়বাবু বললেন,—সেটা তো ঠিক বলতে পারব না। লোকটি প্রায়ই এখানে আসতো। কিছুক্ষণ ওঁর চেম্বারে বসে কথাবার্তা সেরে চলে যেতো।

—নামটা জানেন?

—এক সেকেণ্ড, বলে তিনি একজন বেয়ারাকে ডেকে পাঠালেন। বেয়ারাটিকে সঞ্জয় দত্তই জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা ভৈরব, তোমার কি মনে আছে রজতবাবুর কাছে এক ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন, স্লিপ দিতেন, তার নামটা খেয়াল আছে?

ভৈরব কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল,—সেই ফর্সা মতন বেঁটে খাটো চেহারার লোকটা? চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা?

—হ্যাঁ। তার কথাই বলছি।

—তিনি তো কোনদিনই পুরো নাম লিখতেন না। লিখতেন মিস্টার ঘোষ।

—ঠিক আছে ভৈরব, তুমি এখন যাও।

ভৈরব চলে যাচ্ছিল, নীল ওকে ডেকে বলল,—আচ্ছা ভৈরব, লোকটা তো তারপর আর আসেনি?

—না স্যার। রজতবাবু চলে যাবার পর আর আসবেনই বা কেন?

—লোকটাকে ফারদার দেখতে পেলে চিনতে পারবে?

—পারব স্যার। উনি তো আর একদিন আধদিন আসেননি। প্রায়ই আসতেন। তবে স্যার ওনার দুটো জিনিস আমার খুব মনে আছে।

—কী রকম?

—লোকটা এলেই রজতবাবু কফির অর্ডার দিতেন। উনি চা খেতেন না। আর—

—আর?

—ওনার ডানহাতের কড়ে আঙুলের আগের আঙুলটা ছিল না।

—ছিল না মানে? কাটা?

—হ্যাঁ স্যার। একদিন আমার সামনে সিগারেট ধরাচ্ছিলেন। তখনই দেখেছি।

—খুব ভালো একটা ইনফরমেশন দিয়েছ ভৈরব। থ্যাঙ্কু। তুমি এবার আসতে পার। যদি কোনদিন আইডেন্টিফাই করার জন্যে তোমাকে ডাকি, আসতে পারবে তো?

—হ্যাঁ স্যার। এ আর না পারার কি আছে।

ভৈরব চলে যাবার পর নীল সরাসরি সঞ্জয় দত্তের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—আচ্ছা মিস্টার দত্ত, আপনি তো সিওর রজতশীর্ষ লোকটা একজন চিটিংবাজ। তো, আপনি নিজে কোন খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেননি?

—স্যরি মিস্টার ব্যানার্জী, এ প্রশ্নের কোন জবাব আমার কাছে নেই। ভদ্রলোক আমাদের এখান থেকে চলে গেছেন। আমারও এ ব্রাঞ্চে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। ন্যাচারালি আমি এসব উঁটকো ব্যাপারে মাথা গলাব না। আপনি কি মনে করেন গলানো উচিত?

—তা তো বটেই। এ ব্যাঙ্কের কেউ কি ভিকটিমাইজড?

—হ্যাঁ, বেশ কয়েকজন আছেন। এবং তাদের অবস্থা এখন বেশ শোচনীয়। যদিও তারা প্রত্যেকেই রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিয়েছেন।

—তাদের নাম এবং ঠিকানাটা কি জানানো সম্ভব? অন্তত একজন হলেও চলবে।

—আপত্তি নেই। দেখুন যদি ওঁদের কোন উপকার করতে পারেন। আসলে অতগুলো টাকা চোট যাবার পর চাকরি করা মানুষগুলোর কি অবস্থা হয় সে তো বুঝতেই পারছেন। একজনের নাম মনে পড়েছে। বীরুভাই শ্রীবাস্তব।

—নন বেঙ্গলি?

—সিওর। ঠিকানাটা জেনে বলে দিচ্ছি। সম্ভবত উনি পণ্ডিতিয়া প্লেসের ওদিকে থাকেন, বলেই বেল টিপলেন। ভৈরব এসে দাঁড়ায়।

—স্যার কিছু বলছেন?

—আপাতত শ্রীবাস্তবের বাড়ির ঠিকানাটা একটু এনে দাওতো।

ঘাড় নেড়ে ভৈরব চলে যায়।

—জানাশোনার মধ্যে আর কারও নাম কি মনে পড়ে যারা রজতবাবুর কাছে আসতেন?

সঞ্জয় দত্ত দু চোখের পাতা বন্ধ করে দু মিনিট কিছু মনে করার চেষ্টা করলেন. তারপর বললেন,—রজতশীর্ষবাবু চাকরি ছাড়ার আগে এক ভদ্রলোক ওনার কাছে ঘনঘন যাতায়াত করতেন। এমন তো অনেকেই আসতেন। তবে লাকিলি নামটা জেনে ফেলার একটা কারণ ঘটেছিল। কোন কারণে সেদিন রজতশীর্ষবাবু অফিসে অ্যাবসেন্ট ছিলেন। একে তাকে জিজ্ঞাসা করার সময় আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তখনই নামটা জানতে পারি।

—কি নাম?

—বিশ্বদীপ ঘোষ। মানে ইনিও বি. ঘোষ।

boiRboi.net

নামটা শুনেই যুগপৎ নীল আর দীপু চমকে উঠল। নীল বলল,—ইয়েস, বিশ্বদীপ ঘোষ। এই লোকটাকে আমরা খুঁজছিলাম। কোথায় থাকেন উনি?

—আবার সরি বলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ রজতশীর্ষ অ্যাবসেণ্ট শুনে উনি চলে যান। কোন ঠিকানা না রেখেই।

—দেখতে কেমন?

—বেশ হেলদি চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রঙটা শ্যামলা ধরনের। মিনিট খানেকের দেখা। পরে দেখলে চিনতেও পারব না।

—এরপর উনি আর আসেননি।

—জানি না। আমার চোখে পড়েনি।

—অন্য কেউ বলতে পারেন কি? আপনার ভৈরব?

—ব্যাপারটা কি জানেন উনি আমাদের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট হোল্ডার নন। সো উই আর নট ইণ্টারেস্টেড অ্যাবাউট হিজ হোয়্যার অ্যাবাউটস্।

—আর একটা প্রশ্ন করব, যাদের যাদের টাকা রজতশীর্ষবাবু চোট্ করেছিলেন তারা নিশ্চয়ই থানায় এফ. আই. আর. করেছেন?

—মনে তো হয় করেছেন।

—এবং সবই লোকাল থানায়?

—হোতে পারে। বলা যেতে পারে সেটাই স্বাভাবিক।

নীল উঠে পড়ে। সঞ্জয় দত্তর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে,—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার ইনফরমেশনের জন্যে। বাকি ভিক্‌টিমাইজড্‌দের নাম আর ঠিকানাগুলো কাইণ্ডলি একটু কালেক্ট করে রাখবেন। প্রয়োজনে আমি পরে এসে নিয়ে যাব।

ইতিমধ্যে ভৈরব ফিরে এসে শ্রীবাস্তবের ঠিকানাটা এনে দেয়। কাগজটায় চোখ বুলিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে নীল বলে,—টাকা কেউ ফেরত পাবেন কিনা জানি না। কারণ অভিযুক্ত তো আর বেঁচে নেই। ইভন্ হিজ ওয়াইফ। তবু, সত্যটা তো আমাদের খুঁজে পেতেই হবে।

—ওনার স্ত্রীও কি?

—ইয়েস। শী ওয়াজ মার্ডারর্ড। আ ব্রুটাল এন্ড, অন দ্য সেম ডে।

১২

বাইরে বেরিয়ে এসে দীপু বলল,—কলকাতা শহরের রাস্তায় একটা ছুঁচ হারালে কি সেটা আবার ফিরে পাওয়া যায়?

—কিন্তু শ্রীবাস্তব বা বিশ্বদীপ এরা কেউ ছুঁচ নয়।

—এই বিশাল জনঅরণ্যে একটা লোক কি দুটো লোক ছুঁচেরও অধম। বেকার পণ্ডশ্রম করছ কিন্তু নীলদা।

—দেখাই যাক। আপাতত আমাদের যাওয়া দরকার শ্রীবাস্তবের কাছে। যেহেতু তার ঠিকানা যখন পাওয়া গেছে।

—এখনই যাবে?

—হোয়াই নট? তুই তো জানিস আমি আজকের কাজ কালকের জন্যে ফেলে রাখি না।

—বুঝেছি। চল। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছ? একজন বি.ঘোষ অন্যজন বিশ্বদীপ ঘোষ। দুজনেই একই লোক নয়তো?

—নাহ্। দুজনের চেহারা দু রকমের। তাছাড়া একই নামের দুজন লোক থাকতেই পারে। বি. ঘোষ মানেই তো আর বিশ্বদীপ ঘোষ নয়।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ট্যাক্সির জন্যে একটা গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল। এসময়ে ট্যাক্সি পাওয়াই মুশকিল। হঠাৎ পাখির ডাকের আওয়াজ শুনে দীপু পিছনে তাকিয়ে দেখল এক ভদ্রলোক গাড়ি বারান্দার লাগোয়া দরজায় বেল টিপছেন। দীপু কথা না বলে থাকতে পারে না, ও বলল,—এখন এটা বেশ চলছে। অবশ্য তোমার বাড়ির কুত্তার ডাকের কলিং বেলের থেকে ভাল। একটা কথার সত্যি জবাব দেবে নীলদা?

—বলে ফেল।

—তোমার নন্দিনী দেবী তো প্রায়ই তোমার বাড়ি যাতায়াত করছেন। তা তিনি তোমার কলিং বেল নিয়ে কিছু রিমার্ক করেননি?

—হ্যাঁ করেছিলেন। আমি পাল্টাবো না জেনে উনি ঠিক করেছেন একটা বাঘের ডাকের বেল কিনে আমার দরজায় সেঁটে দিয়ে যাবেন।

—তুমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে সেটা নেবে?

—কিছু কিছু ব্যাপার প্রতিজ্ঞা মানে না। আমি তো আর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করিনি।

—তাহলে ব্যাপারটা এবার সেট্‌ল্ করে ফেলো। নিশ্চয়ই তোমার কোন প্রেজুডিস নেই?

—কিসের প্রেজুডিস?

—তোমার প্রেমিকার একবার বিয়ে হয়েছিল। যদিও সে সব চুকেবুকে গেছে। কিন্তু এখনও তোমরা দুজন দুজনকে ভুলতে পারনি। তা এই ছন্নছাড়া

BanglaBook.org

জীবন না কাটিয়ে এবার একটা জায়গায় চলে এসো। নীলদা, তোমাদের নিয়ে কেউ কেউ কিছু কথা বলছেন। কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে না। বিশেষ করে মহিলার সম্বন্ধে।

নীল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে আলতো করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো,—লোকের কথায় আমি কিছু মাথা ঘামাই না। সেদিন তোর অজুদা এসেছিল। সেও তোরই মতো কিছু জ্ঞানট্যান দিয়ে গেল। নন্দিনীও সুযোগ পেলে খোঁটা দেয়। কিন্তু—

—না নীলদা, তোমার মধ্যে তো 'কিন্তু'-'টিন্তু' ব্যাপার কোনদিনই ছিল না। আজ কেন এসব দোনামোনা?

—ওই যে, যে সময়ের যা। আসল সময়টা যে কখন হারিয়ে গেছে।

—কিন্তু কিছুই হারিয়ে যায় না নীলদা। সব থাকে লুকিয়ে। কেবল তাকে খুঁজে নিতে হয়।

—বাব্বা...তুই দেখি ক্রমশ ফিলজফার হয়ে যাচ্ছিস।

—ফিলজফি তো জীবনের বাইরে নয়। ফিলজফি হচ্ছে জীবনের উপলব্ধি।

—আমরা আজ কি করতে বেরিয়েছিলাম সেটা তোর মনে আছে?

—আছে।

—তাহলে সেই কাজটাই করি চল। তুই নিশ্চয়ই আমায় চিনিস।

—নাহ্, ভবি ভোলার নয়। তোমার আর হিল্লে হবে না। ভুলে যেও না নীলদা, বুড়ো বয়স ইজ নকিং অ্যাট ইওর ডোর। যেটা নন্দিনী দেবী বুঝেছেন সেটা তুমি বুঝতে পারছ না বা চাইছ না। ভেরি ব্যাড।

—চল, ট্যাক্সিটা খালি হয়েছে। উঠে পড়ি। বড়বাজার থেকে জ্যামজট কাটিয়ে পণ্ডিতিয়া প্লেসে পৌঁছতে সময় লাগবে।

ট্যাক্সিতে তেমন কোন কথা হোল না। আসলে দুজনেই দুজনের ভাবনা নিয়ে যাচ্ছিল। নীল ঘুরে ফিরে ভাবছিল দীপুর কথাগুলো। সত্যিই তো বেলা বয়ে যাচ্ছে। পুরুষের জীবনে নারীর প্রয়োজন আছে। নিশ্চয়ই আছে, সে কখনও মা, কখনও বোন, কখনও স্ত্রী, কখনও প্রেমিকা। স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ভূমিকা আছে। তারা যথাযথ সেটা পালন করে। কিন্তু পুরুষ এতোই হ্যাংলা নারীর সব ভূমিকারই প্রতিফলন পেতে চায় নিজের জীবনে। সেও বোধহয় তাই চায়। নন্দিনীকে সে আজও ভোলেনি। ভুলতে পারেনি। মাঝে এগোরো বছরের ব্যবধান। জার্মানী থেকে ফেরার পর আবার সে পুরনো নন্দিনীকে ফিরে পেয়েছে। হয়তো নন্দিনী তেমনই আছে। কিন্তু সে? সেও কি তাই আছে?

এতোদিন পর তার মনে হচ্ছে, কেন হচ্ছে তার ব্যাখ্যা হয়তো আছে, কিন্তু তাই নিয়ে খুঁটিনাটি মনোবিশ্লেষণে যায়নি। কেবল তার ভয়, নন্দিনীর সঙ্গে যদি তার আজকের বন্ধুতার বন্ধন ছিঁড়ে যায়? যদি নন্দিনী আর পাঁচটা মেয়ের মতো অতি সাধারণ হোয়ে যায়! নন্দিনীকে কাছে পেতে গিয়ে নন্দিনী যদি অনেক দূরে চলে যায় নিত্যদিনের অভ্যাসে? সে বড় করুণ। সে বড় বিষণ্ণতার দিন। পেতে গিয়ে যদি নন্দিনী চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যায়!

—আর ভেবো না গুরু। আমরা এসে গেছি।

চিন্তা থেকে সরে আসে নীল। অনেকটা সময় কেটে গেছে। ওরা তখন ট্যাঙ্গুলার পার্কের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার বাঁদিকে সোজা। শ্রীবাস্তবের বাড়ি পেতে দেরি হোল না। তিনতলা বাড়ি। কিন্তু শ্রীবাস্তব থাকেন একতলায়। দরজায় নেমপ্লেটে লেখা বীরুভাই শ্রীবাস্তব?

বেল টিপতেই বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দাঁড়ালেন। হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে নীল বলল,—শ্রীবাস্তবজী আছেন।

—হ্যাঁ, বলুন, আমি বীরুভাই শ্রীবাস্তব।

ভাষার কোথাও কোন রকম অবাঙালি টান নেই, চেহারায় হয়তো কিছুটা ইউ. পি.র ছাপ আছে। বয়েস পঞ্চাশ বাহান্নর মধ্যে। গায়ের রঙ হয়তো একদিন বেশ পরিষ্কার ছিল। এখন প্রায় তামাটে। চুল ব্যাকব্রাশ করা হোলেও তা প্রায় বিরল হোতে চলেছে। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত কামানো। পরনে গোল গলা আদিদাস ছাপ্পা মারা গেঞ্জী আর বারমুডা। পায়ে স্যানডাক। নীল কয়েক সেকেণ্ড ভদ্রলোককে নিরীক্ষণ করে নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিল।

কার্ডটা দেখতে দেখতে ভ্রূটা সামান্য কোঁচকালো। কিন্তু তা সামান্য সময়ের জন্যে। তারপরই ম্লান হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে এনে বললেন,

—বাট, হোয়াই অ্যান ইনভেস্টিগেটর টু মি? এনি প্রবলেম?

—যদি আপনার কোন অসুবিধা না থাকে একটু বসে কথা বলা যেতো।

—ওহ্ সিওর। আসুন।

ভদ্রলোক নীল আর দীপুকে নিয়ে গিয়ে বসার ঘরে বসালেন। মোটামুটি সবই আছে। সোফা সেট, বুক সেল্ফ। কিছু ইংরেজি বই। কিছু হিন্দি বই। হ্যাঁ আছেন, রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ। আর আছেন রামসীতা। ঘরের একদিকে কালারড্ টিভি। অন্যদিকে কমপিউটার সেট। চোদ্দ ইঞ্চি মনিটার। কী বোর্ড।

সোফায় বসতে বসতে নীল বলল,—আপনি কি কমপিউটারও হ্যাণ্ডেল করেন?

BanglaBook.org

—অফিসে থাকতে হাতটা সড়গড় হয়েছিল। তবে এটা এখন আমার জন্যে নয়। ছেলের জন্যে। ও কমপিউটার গ্রাফিক্স শিখছে। চাকরির আশা তো আর করি না। দেখা যাক ছেলেটা যদি কিছু এগুতে পারে।

কথা বলতে বলতে একটি বছর পনেরো ষোল বয়েসের ছেলে দু গ্লাস জল এনে টেবিলে রেখে দিল। এটা সম্ভবত অতিথি আপ্যায়নের প্রাথমিক রীতি।

শ্রীবাস্তব বললেন,—মিস্টার ব্যানার্জি, নিশ্চয়ই চা চলবে?

—আপত্তি নেই।

নিজের ভাষায় ছোকরাটিকে কিছু বলে নীলের দিকে ফিরে বললেন,—এবার বলুন স্যার, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

—স্টেট ব্যাঙ্কে আপনি কতদিন আছেন?

—এখন তো নেই। আমি ভি. আর নিয়েছি। তা ধরুন বছর খানেক হবে।

—আর কতদিন চাকরি ছিল?

—মিনিমাম আট বছর।

—ব্যাঙ্কের চাপে?

—সেই রকম চাপ ব্যাঙ্ক এখনও দেয়নি। কিন্তু আই ওয়াজ বাউণ্ড টু অ্যাকসেপ্ট ভি. আর। আসলে কি জানেন, আমি একটা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলাম। হি ওয়াজ আ চিট্। বুঝতে পারিনি, লোকটার পেটে পেটে এতো সর্বনাশা বুদ্ধি।

—লোকটি কে?

—মিস্টার রজতশীর্ষ নন্দী। কোথাও কোথাও আবার প্রভাকর দত্ত, যেটা পরে জেনেছি। আমাদেরই ব্রাঞ্চে উনি ছিলেন লোন অফিসার। অবশ্য ওর সম্বন্ধে কানাঘুষোয় কিছু এদিকওদিক করার খবর ভাসা ভাসা হয়ে আসতো। কিন্তু সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কারণ, ওর র‍্যাঙ্ক আর আমার পজিশন দুটোর অনেক ডিফারেন্স। যাই হোক একদিন শুনলাম বাইপাশের দিকে উনি একটা বিশাল জমি অ্যাকোয়ার করেছেন।

—একস্‌কিউজ মি, ওদিকে জমির দাম তো অনেক। তো এতো টাকা উনি পেলেন কোথা থেকে?

—উনি নিজে লোন স্যাংশন করার চার্জে ছিলেন। অনেক রথী মহারথী, মন্ত্রী, আমলা এদের সঙ্গে ওঠাবসা। টাকার জোগাড় করা ওর পক্ষে খুব একটা ভাবার কথা নয়। তার আগে আমার কথাটা শুনুন।

—বেশ! বলুন।

—একসময়ে অফিসে রাষ্ট্র হয়ে গেল উনি ওখানে মালটি স্টোরিড স্কীমে একটা বিশাল কমপ্লেক্স তৈরি করছেন। স্বাভাবিক কারণেই আমরা মানে ওই ব্রাঞ্চের অনেকেই ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিলাম। এই শহরে নিজের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। আমাদের মতো চাকুরিজীবীর কাছে স্বপ্নের মতো। তাও একবারে পেমেন্ট নয়। প্রথমে দু লাখ টাকা দিতে হবে। বাকিটা দশবছরে, মানে যার যতদিন চাকরি আছে তার মধ্যে উইথ ইন্টারেস্ট ক্লীয়ার করে দিতে হবে। এর থেকে আর সহজ উপায়ে কি ভাবেই বা ওনারশিপ ফ্ল্যাট পাওয়া যায়!

—হুঁ। তারপর?

—প্রথম দিকে যে একটু দোনামোনা করিনি তা নয়। সব থেকে বড় কথা যিনি অ্যারেঞ্জার তিনি খোদ ঐ ব্রাঞ্চেরই হায়ার অফিসার। সব সংশয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমরা কয়েকজন ওঁর খাতায় নাম লেখাই।

—দু লাখ টাকা কী নগদ দিয়েছিলেন?

—বলতে পারেন। তবে নিজের কাছে তো অতটা ছিল না। অফিস থেকে লোন নিয়ে ওনার অ্যাকাউন্টে ডেবিট করে দিই।

—সাইট দেখে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ। টানা জমি পড়ে আছে। যেকোন একটা দেখিয়ে দিলেই হোল।

—এ কথা বলছেন কেন?

—পথে বসার পর জানতে পারি সে জমি অন্য প্রোমোটারের নামে নেওয়া আছে।

—আপনারা কোন প্ল্যানট্ল্যান দেখেননি?

—হ্যাঁ দেখেছি। সমস্ত ভারতবর্ষটাই তো বেপ্ল্যানে চলছে। তা একটা বেপ্ল্যান তৈরি করা এবং শো করার মধ্যে তেমন কোন অসুবিধা আছে বলে মনে হয় না। সব কিছুই তো টাকার লেনদেনে চলছে। হ্যাঁকে না, নাকে হ্যাঁ, এসব তো জলভাত।

—তারপর?

—কথা ছিল ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টের ছ মাস পর ওদের কাজ শুরু হবে। অ্যালটমেন্ট হবে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভের ওপর। তো ছ মাস কেটে যাবার পর আমরা যে কজন টাকা জমা দিয়েছিলাম তারা একদিন স্পট্টা গিয়ে দেখে এলাম। হ্যাঁ কাজ শুরু হোয়ে গেছে। ভিত তৈরির কাজ তখন প্রায় শেষ। সেদিন মনে খুবই আনন্দ হয়েছিল। আমরা অফিসের কজন গিয়ে সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, মোটামুটি কতদিনের মধ্যে বাড়ি কমপ্লীট হবে।

BanglaBook.org

উত্তরে উনি হেসে বলেছিলেন, চিন্তা করবেন না, আপনারা ঠিক সময়ে ফ্ল্যাটের চাবি হাতে পাবেন। তবে চাবি যেদিন থেকে পাবেন তার পরের মাস থেকেই কিন্তু আপনাদের মাইনে থেকে প্রোপরসানেটলি ডিডাকশন শুরু হবে। এটা তো আমরা জানতাম। তাই আর কোন কৌতূহল দেখাইনি। তারপর—

—তারপর?

—কমপ্লেক্স তখন শেষ পর্যায়ে, এবার তো অ্যালটমেন্টের ব্যাপার। আমরা আবার গিয়ে রজতশীর্ষকে ধরলাম যাতে আমাদের মানে অফিস স্টাফেদের ফ্ল্যাটগুলো ভালো জায়গায় পড়ে এটা যেন উনি দেখেন। ফের উনি আমাদের আশ্বস্ত করে অকারণ চিন্তা করতে বারণ করে দিলেন।

—বাইরের পার্টি কতজন ছিলেন?

—ম্যাক্সিমাম তো বাইরের লোক। আমাদের ব্রাঞ্চের তো সাকুল্যে দশজন।

—এরপর?

—হ্যাঁ এরপর। আরো মাসতিনেক পর। আমাদের কোলিগ রথীন এসে যা বলল তাতে হার্টস্ট্রোক হবার উপক্রম।

—সংবাদটা কি?

—কমপ্লেক্সের সব ঘরই বুক্‌ড্ হয়ে গেছে। এবং লোকেরা এসে যে যার পজেশন নিতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা ছিল অন্যরকম। কমপ্লেক্স কমপ্লীট হবার আগেই উনি আমাদের মধ্যে সবার আগে লটারি করে নেবেন। তারপর বাইরের লোক। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগেনি। ফের আমরা গেলাম রতজশীর্ষবাবুর কাছে। প্রায় তখনি মাথায় বজ্রাঘাত হবার অবস্থা। রজতশীর্ষ ভি আর নিয়ে কোথাও চলে গেছেন। যেটা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি।

—তার মানে?

—মানেটা বুঝলাম বাইপাশে গিয়ে। আমাদের যা দেখানো হয়েছিল এবং যে ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে তার কোনটাই রজতশীর্ষের নয়। ও জমিটা কিনেছিল, শহরের এক নামকরা প্রোমোটার পিঙ্কি মালহোত্রা।

—মহিলা প্রোমোটার?

—অ্যাকচুয়ালি ওটার অরিজিন্যাল প্রোমোটার ওনার হ্যাজব্যাণ্ড দিনেশ মালহোত্রা। সে যাই হোক, ওখানে রজতশীর্ষ নন্দী বলে কেউ নেই। কোনদিন ছিলও না।

—এর পর আপনারা আর রজতবাবুর খোঁজ করেননি?

—চষে ফেলেছি। গায়ের রক্ত জল করা টাকা। নাহ্, কোথাও খুঁজে পাইনি। দু একজনের কাছে ওই প্রভাকর দত্ত নামটা শুনেছিলাম। লোকটা যেন ভোজবাজির মতো উবে গেছে। অনেক এফ আই আর করেছি, কিন্তু প্রভাকর বা রজতশীর্ষ নন্দীর ট্রেস পাইনি। তবে—

—তবে?

—একজন তার হদিশ দিতে পারতো।

—কে তিনি?

—সাম বিশ্বদীপ ঘোষ।

নীল আর দীপু চমকে ওঠে। নীল প্রশ্ন করে,—ইয়েস, এই বিশ্বদীপ ঘোষকেই আমরা খুঁজছি। হোয়্যার হি ইজ?

—উনি আমাদের ব্যাঙ্কের কেউ নন। আউটসাইডারদের কেউ একজন। ঘন ঘন ব্যাঙ্কে আসতেন। রজতশীর্ষের পার্সোন্যাল চেম্বারে অনেকক্ষণ কাটিয়ে চলে যেতেন। আমার মনে হয় ভদ্রলোক সম্ভবত ওয়াজ ওয়ান অব দ্য ক্যান্ডিডেট্স্ অর মে বি হিজ ফ্রেণ্ড। নয়তো নন্দীরই কোন পার্টনার।

—কিন্তু তিনি কোথায়?

—জানি না। রজতশীর্ষ উধাও হবার পর তিনিও আর ব্যাঙ্কে পা মাড়াননি।

—অথচ—

—হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অথচ, শ্রীবাস্তব উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করেন।

—খবর আছে লোকটা রেগুলার রজতশীর্ষর বাড়ি যাতাযাত করতো?

—নিশ্চয়ই পাওনা টাকা আদায় করতে। অথবা স্যাঙাতদের দোস্তি।

—বলতে পারব তখনই যখনই লোকটাকে খুঁজে পাব।

—মিস্টার ব্যানার্জি ডু ইউ নো রজতশীর্ষর প্রেজেণ্ট অ্যাড্রেস?

—জানি। কিন্তু আপনি কি আর কোন খবর রাখেন না বা পাননি?

—কী খবর রাখব? ভি. আর. নিয়ে যে টাকা পেয়েছিলাম তার থেকে ব্যাঙ্কের লোন মিটিয়ে আমি বেরিয়ে আসি। মানুষের ওপর বিশ্বাস আর বাড়ির বার হই না। এফ. আই. আর. করেছিলাম। বাট নো নিউজ। একবার তার ঠিকানাটা আমায় বলুন স্যার। প্লীজ।

—প্রথমত আপনাদের কিছু করার নেই। প্রতারকের বিরুদ্ধে শমন জারি হোতে পারে, তার খোঁজ পেলে তাকে অ্যারেস্ট করা যেতো। কিন্তু প্রতারক কোথায়? সে আপনার আমার নাগালের বাইরে।

—হোয়াট ডু ইউ মিন বাই নাগালের বাইরে?

BanglaBook.org

—হি কমিটেড সুইসাইড।

—সুইসাইড, থেমে থেমে এমনভাবে কথাগুলো বললেন শ্রীবাস্তব, যেন বাতিঘরের শেষ বাতিটা নিভে গেছে। তিনি ছিটকে পড়েছেন আরও গভীর কোন দহে।

খানিকক্ষণ বিরলকেশে হাত চালাতে চালাতে শ্রীবাস্তব বললেন,—বড্ড বোকা বনে গেলুম স্যার। জানেন, এর মধ্যে আমার একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল। অ্যাণ্ড ডক্টর অ্যাডভাইস্‌ড্‌ মি, টাকার শোক না ভুললে যে কোনদিন শিভিয়ার কিছু হোয়ে যেতে পারে। মিস্টার ব্যানার্জি, অনেক শোক ভোলা যায়, কিন্তু অর্থ শোক বড় শোক। কে যেন বলেছিল, একটা প্রোভার্ব, হোয়েন মনি ইজ লস্ট নাথিং ইজ লস্ট, ফুলস্‌ ফিলসফি—

নীলের কিছু বলার ছিল না। তবু সান্ত্বনা দিতে দিতে ও বলল,—তবুও মিস্টার শ্রীবাস্তব, ঐ উপদেশই আমি দোব, যা গেছে তা আর কোনদিনও ফিরে আসবে না। কিন্তু এখনও যা আছে, শোকটা তাড়াতে পারলে আবার বাঁচতে পারবেন। ধরে নিন না আপনার মেয়ের বিয়েতে দু লাখ টাকা খরচ করেছেন।

ম্লান হাসলেন শ্রীবাস্তব। তারপর বললেন,—আমার মেয়ের বয়েস এখন চব্বিশ। আনম্যারেড। এর পর তো তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নাউ, ডু ইউ মিন টু সে দ্যাট আই শ্যাল হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ অ্যানাদার টু ল্যাক ফর মাই ডটারস্‌ সেকেণ্ড ম্যারেজ?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। ইতিমধ্যে সামোসা লাড্ডু আর মশলা দেওয়া চা এসে গিয়েছিল।

নীল তা দেখে বলল,—আপনি যা বললেন তার পরে কি আর এগুলো মুখে রুচবে?

—কিন্তু শত দুঃখ হলেও আমাদের প্রতিদিনই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে খরচ করতে তো হয়ই। আর আত্মীয় স্বজন বা অতিথি এলে আমাদের কাস্টামস্‌ অনুযায়ী তাদের খালি মুখে ফেরানো যায় না। আপনারা খেতে শুরু করুন। আদারওয়াইজ আমি খুব দুখ পাবো।

অগত্যা।

১৩

ব্যাঙ্কের যে দশজন রজতশীর্ষর ফাঁদে পা দিয়েছিল, সবার বাড়িতেই নীল একবার করে ঢুঁ মেরেছে। প্রত্যেকেই বিশ্বদীপ ঘোষের উল্লেখও করেছে। কিন্তু তারা

কেউই লোকটার সঠিক কোন খবর দিতে পারেনি। লোকটা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। অথচ এ লোকটাকে না পেলে ক্ষণপ্রভা হত্যা বা রজতশীর্ষর মৃত্যুরহস্য উদ্ধার করা যাবে না। নীল আর দীপু নিজেদের ঘরে বসে দুটো রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে ভাবছিল। এরই মধ্যে পুলিস অফিসার বিকাশ তালুকদার এসে হাজির। বিকাশবাবুর সঙ্গে নীলের একটা অন্য ধরনের আত্মিক সম্বন্ধ তৈরি হয়ে গেছে। একটু ফাঁক পেলেই উনি চলে আসেন নীলের আড্ডায়। সম্প্রতি নীলের বাড়িতে আর একজন অতিথির আগমন ঘটছে যখন তখন। বিশেষ করে ছুটির দিনে। তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী নন্দিনী। নন্দিনীর সঙ্গে নীলের একটা প্রথম যৌবনের প্রেম আর বিচ্ছেদের কাহিনী লুকিয়ে আছে। যেটা এখন সবারই জানা। একটা চিঠি, তার উত্তর আর পোস্ট অফিসের বদান্যতায় দুটো জীবনের ভুল বোঝাবুঝি। তারপর কেটে গেছে এগারোটা বছর। নন্দিনীর বিয়ে, জার্মানীতে অবস্থান, স্বামীর মৃত্যু। ফিরে আসা কলকাতায়। পরিহাসপ্রিয় প্রকৃতির রসালো নিয়মে প্রেমিক প্রেমিকার পুনর্দর্শন এবং নতুন করে ভাবাবেগ গজিয়ে ওঠা। আজ দুজনেরই বয়েস হয়েছে। একজন পঞ্চাশ থেকে একটু পিছিয়ে অন্যজন পঞ্চাশের ঘরটা পেরিয়েছি কটা বছর আগে।

বিকাশ বলেন,—পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। আর পুরনো প্রেম আকাশে ওড়ে। তাতে ইন্ধন জোগায় দীপু। সামাজিক কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। প্রেমিকার দিক থেকেও নেই কোন পিছুটান। কিন্তু আধুনিকমনস্ক, আর এখনও ডাকাবুকো নীল কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে বারে বারেই। তার কেবলি ভয়। প্রেমিকা যদি হারিয়ে যায় দৈন্যন্দিন অভ্যাসের জাঁতাকলে। প্রেমের মৃত্যু ঘটলে আর যা থাকে সেটা মহাশ্মশানের হাহাকার ছাড়া আর কিছু নয়। দীপু বলে, এ তোমার বিরহবিলাস।

বিকাশ আফশোস করেন, —নাহ্ মশাই, নীল ব্যানার্জির কাছে এসব অজুহাত শুনতে ইচ্ছে করে না। এই তো দেখুন না, পুলিসের এই জঘন্য কাজ, গিন্নির হাজার অনুযোগ। তা সত্ত্বেও—

সৎ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে আজও বিকাশ তালুকদার পুলিসি কৌলিন্যে জাতে ওঠেননি। জীবনধারণের মান অতি সামান্য। সেই কথার নজির টেনে তিনি বলতেন,—ভালবাসাটাই সব। সেটা আসে মন থেকে। মন সাচ্চা তো জগৎ সাচ্চা। আমার বউয়ের অনুযোগ আছে কিন্তু প্রেমও আছে। ওটা একটা শিল্প। আপনার মতো জ্ঞানী মানুষকে এসব বলা ধৃষ্টতা। তবে দেরি হলেও, জীবন হাতছানি দিচ্ছে। তাকে মশাই অবহেলা করবেন না।

শুনে নীল হাসতো। সিগারেট ধরাতো। যদি সেদিন নন্দিনী আসতো আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টিমিষ্টি হাসতো।

সব মিলিয়ে যখন এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা তখনই রজতশীর্ষ আর ক্ষণপ্রভা ওর ঘাড়ে চেপেছে। কেউ চাপায়নি। কিন্তু—

এই কিন্তুর জের টেনে বিকাশ বললেন,—কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে ছাড়বে না। তা কেস কদ্দূর মশাই। ওখানকার ইন্সপেক্টর কি যেন নাম, ও হ্যাঁ সত্যশোভন মজুমদার। তিনি কি বলছেন?

—কী আর বলবেন! কেসটার আগাপাশতলা কিছু দেখা যাচ্ছে না। স্বামী স্ত্রী দুজনেই শেষ। ঘরে তল্লাসি চালিয়ে পাওয়া গেছে প্রচুর টাকা। কাঁচা টাকা। ব্যাঙ্কে খবরাখবর নিতে গিয়ে যা বোঝা গেল রজতশীর্ষ লোকটা সুবিধের নয়। দু নম্বরি কাজকারবার করে অনেক টাকা করেছে। এবং ব্যাঙ্কে বা অন্য কোথাও সেভিংস করার মতো উপায় ছিল না। ফলে টাকাকড়ি বাড়িতেই থাকতো।

বিকাশ প্রশ্ন করেন,—ওনার স্ত্রীটি কেমন? শুনেছি উনি নাকি গান বাজনা নাটক এইসব নিয়েই থাকতেন।

—আপনি কি করে জানলেন?

—কেন দীপুই বলেছে। আচ্ছা ব্যানার্জি সাহেব, রজতশীর্ষ যখন ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন সেখানে নিশ্চয়ই তার হোম অ্যাড্রেস ছিল?

—হ্যাঁ ছিল বৈকি। সেটি জয়নগরের দিকে। পরে সেটি চেঞ্জ করে উনি বর্ধমানে একটা বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সেটি ফল্‌স্। সেখানে কেউই ওই দুটি নামে কাউকে চেনে না।

—তাহলে ওরা থাকতেন কোথায়?

—জগদ্দলে। মাস আষ্টেক আগে ওখানে একটা ফ্ল্যাট কিনেছিলেন।

—ওদের কোন ছেলেপুলে নেই?

—না।

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই নন্দিনী এসে গিয়েছিল। আলোচনা শুনতে শুনতে হঠাৎ ও বলল,—নীল তোমার আরও একটা জায়গায় খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।

—কোথায়?

—ক্ষণপ্রভা দেবীর বাড়িতে।

—মহিলার হোয়্যার অ্যাবাউট্‌স্ তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। উনি যে কালচারাল গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারাও কোন হদিশ দিতে পারেনি।

—ওঁর গানের স্কুলে খবর নিয়েছিলে?

—স্কুল বলতে ওনার নিজের পারলার। ওখানেই উনি কিছু মেয়েদের গান শেখাতেন।

দীপু অনেকক্ষণ বসে বসে দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল। সে বলে উঠল, —একটা লোকের খোঁজ পাওয়া খুবই দরকার, বুঝলে নন্দিনীদি।

—কার? বিশ্বদীপ ঘোষের?

—ইয়েস। পশ্চিমবঙ্গের কোন প্রান্তে সে ঘাপটি মেরে বসে আছে, সেটা খুঁজে পাওয়াই দরকার।

—আচ্ছা ব্যানার্জি সাহেব, বিকাশ প্রশ্ন করলেন, লোকটার চেহারার কোন আভাস পেয়েছেন?

—লোকটা তো নয়। আমার দরকার দুজনকে। বি. ঘোষ অ্যাণ্ড বিশ্বদীপ ঘোষ। একজনের গায়ের রঙ ফরসা, বেঁটেখাটো, ব্যাকব্রাশ করা চুল, প্যাণ্ট আর টি শার্ট পরেন, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। আর একজন মিলিটারি মার্কা চেহারা। দোহারা, গাট্টাগোট্টা। শ্যামলা রঙ। দুজনেই নিরুদ্দেশ।

নন্দিনী ফিক্ করে হেসে ফেলে বলে,—এই দুজনের চেহারা যা বর্ণনা দিলে সারা পশ্চিমবঙ্গে খুঁজলে লাখখানেক লোক পেয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, মাথা দোলাতে দোলাতে নীল বলল, সমস্যা সেখানেই। এর মধ্যে বি. ঘোষের ডানহাতের অনামিকাটি নেই। মানে কাটা। স্টেট ব্যাঙ্কের বেয়ারা ভৈরবের স্টেটমেণ্ট তাই।

—তাই বোলে তো আর বেঁটেখাটো ফরসা চেহারার লোক দেখলেই তাকে বলা যায় না, মশাই আপনার ডান হাতটা দেখি তো। বোলেই দীপু নিজে নিজেই হাসলো।

—আচ্ছা নীল, নন্দিনী প্রশ্ন করে, দুটো মিসহ্যাপ যেদিন ঘটে, ওই দুজনের কেউ কি সেদিন ওই ফ্ল্যাটে গিয়েছিল?

খানিকটা ভেবে নীল বলল,—চোহারার ডেসক্রিপশন মানলে বিশ্বদীপ ঘোষ দুপুরে নন্দীদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। এবং দুপুর বারোটা নাগাদ রজতের সঙ্গে বেরিয়েও গিয়েছিল। মিসেস ঊর্মিলা যাকে বিশ্বদীপ বলছেন, সঞ্জয় দত্ত তাকে বলছেন বি. ঘোষ। এবং উনি যাকে বিশ্বদীপ বলছেন তিনি আমাদের বর্ণনার সেকেণ্ড ম্যান। এবং কনফিউশন সেখানেই। আসল বিশ্বদীপ কে এবং সে কোথায়? ওদিকে মিতা দাস বলে মেয়েটিকেও খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। কিছু যেন একটা চেপে যাচ্ছে। বিশ্বদীপ প্রসঙ্গ উঠতেই মহিলা সাত তাড়াতাড়ি সেটি

ধামাচাপা দিতে চাইল, কেন? তবে কি মিতা জানে বিশ্বদীপের চালচুলো? বিকাশবাবু, অনেকদিন পর একটা বেশ গোলমেলে কেসে জড়ালাম, কি বলেন?

বিকাশ অলুকদার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই নীলের মোবাইল বেজে উঠল একটা বিখ্যাত ইংলিশ মিউজিকের সুরে। ফোন তুলে নাম্বারটা কার ও আন্দাজ করতে পারল না। তবু লাইন 'অন' করে ও 'হ্যালো' বলে সাড়া দিল। ওপাশ থেকে ভেসে এলো এক মহিলা কণ্ঠস্বর,—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কে কবে মিশন সাক্সেস করতে পেরেছে, মিস্টার নীলাঞ্জন ব্যানার্জি?

—আপনি কে বলছেন?

—নাম বলে লাভ নেই। চিনবেন না।

—ভালো কথা। তা আমাকে থ্রেট করা ছাড়া আপনার আর কিছু বলার আছে?

—বলার কথা একটাই, যে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে তাকে ঘুমতে দিন।

—কার ঘুম পেয়েছে?

—ঘটনাটার। আপনি জানবেন কিনা জানি না। রজতশীর্ষ আর তার বউ উচিত শাস্তি পেয়েছে। এটাই হওয়া উচিত ছিল। আইন তো সত্যিকার অপরাধীর টিকি ছোঁয় না। ছুঁলেও হাত সরিয়ে নেয়। অথচ ওদের শাস্তি পাওয়া দরকার। কে দেবে? তাই তো সারা ভারতবর্ষে এখন আইন নিজের হাতে তুলে নেবার প্রবণতা কেউ রুখতে পারছে না। আপনিও পারবেন না এ কেসের ধারেকাছে যেতে। বন্ধুর মতো উপদেশ দিচ্ছি, আপনার মাথার সব চুল পেকে গেলেও আসল অপরাধীকে ধরতে পারবেন না।

—বুঝলাম। বিশ্বদীপ ঘোষ কোথায় থাকেন সেটি বলবেন কি?

—এখনও এই পৃথিবী নামক গ্রহেই আছেন। তবে কতদিন সেটা আমিও জানি না।

—তার মানে আপনি বলছেন উনিও মার্ডার হতে পারেন?

—সেটা ভবিষ্যৎই বলবে। যা বললাম সেটাই করুন। নইলে আপনিও বিপদে জড়িয়ে যেতে পারেন। পরমায়ুর জোর না থাকলে ব্যাপারটা ফেটাল হোতে পারে।

—ধন্যবাদ, আপনার উপদেশের জন্যে।

—মনে রাখলেই ভাল। আর একটা কথা, যে নাম্বারটা আপনার মোবাইলে উঠেছে সেটা একটা পাবলিক কল অফিস থেকে করা। খোঁজ-খবর নিয়ে এখানে এলেও কোন লাভ হবে না। নমস্কার।

বলেই লাইনটা কেটে দিল ওপাশের মহিলা। মোবাইলের স্ক্রীনে ও নাম্বার দেখল। তারপর মোবাইল অফ করে কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। তখন ওর দিকে তিনজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে। তিনজনেই উৎসুক ব্যাপারটা কি জানার জন্যে। দীপুর ধৈর্য কম।

প্রথম প্রশ্ন ওই করল,—গুরু, নিশ্চয়ই কোন শকুন ফোন করেছিল। কোন্ ভাগাড় থেকে?

নীল মৃদু হাসল। তারপর বলল,—কি করে বুঝলি ফোনটা কোন ভাগাড়ের শকুন করেছে?

—দেখ গুরু। তোমার সঙ্গে দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর একসঙ্গে কাটিয়ে দিলাম। তা তোমার মুখভঙ্গীর পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারব না?

ওপর নীচে ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে নীল বলল,—শকুন নয় শকুনী। তবে ওই সব গাঁইয়া বিশেষণগুলো প্রয়োগ করছি না। একজন মহিলা, রীতিমতো শাসালো।

—সে কি মশাই, বিকাশ তালুকদার একটু কৌতুক মেশানো স্বরে বললেন, এ তো বাঘের ডেরায় ঢুকে বাঘকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়ে গেল। আমার মনে হয় মহিলা বা তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা নীল ব্যানার্জিকে ঠিকমতো এখনো চিনতে পারেনি।

—না বিকাশবাবু, আপনি অভিজ্ঞ লোক। কাউকে আণ্ডার এস্টিমেট করা কী উচিত? শত্রুকে কখনও নেগলেক্ট করতে নেই।

—হয়তো আপনি ঠিকই বলেছেন। এই হুমকি যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় তাহলে নিশ্চয় বুঝে নিতে হবে দেয়ার লাইজ সাম ফাউল প্লে আর আমরা ঘটনার কাছাকাছিই আছি।

—হ্যাঁ। তাই। আগাগোড়াই আমার কাছে ঘটনাটা সিধেসাপ্টা মনে হয়নি। যে কোন কারণেই হোক একই দিনে দুজনের মৃত্যু এবং তারপর টেলিফোনিক হুমকি। দীপু, কাল একবার জগদ্দল যাওয়া দরকার।

—চল। বেশি তো দূর নয়।

—আমি ভেবেছিলাম স্বপ্নার দিক থেকে কোন খবর পাব। সে যাই হোক, মিতা দাসকে একটু নাড়াচাড়া দরকার।

নন্দিনী সাধারণত নীলের তদন্তের ক্ষেত্রে কোন মন্তব্য করে না। কারণ এ ব্যাপারে তার তেমন কোন ভাবনা চিন্তাও নেই। তবে বৈবাহিক সূত্রে ওর কিছু

BanglaBook.org

বিদেশটিদেশ ঘোরা আছে। তথাকথিত নিরীহ গুড়ি গার্ল নয়। বহির্জীবনের অভিজ্ঞতাও হয়েছে অনেক। ও ধীরে ধীরে বলল,—নীল, যতই বল না কেন এবার কিন্তু তুমি এখনও পর্যন্ত রহস্যের ধারেকাছে আসতে পারনি। আমার মনে হয় রহস্যের কেন্দ্রে পৌঁছতে গেলে দুটো মৃত মানুষের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের আনাচেকানাচে যেতে হবে। আচ্ছা একটা কথা জিগ্যেস করি, ক্ষণপ্রভা দেবীর ফ্ল্যাট থেকে কোন ক্লু পাওনি?

খানিকক্ষণ ভেবে নীল বলল,—একটা সাজানো গড়ি ফ্ল্যাট। আপাত দৃষ্টিতে ধনী গৃহ বলেই মনে হবে। সোফাটোফাগুলো এবং আসবাবপত্র যা ছিল সবই হাইফাই। এবং রুচিপূর্ণ। মেহগিনি কাঠের আলমারির মধ্যে গুপ্তচেম্বারে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। বেশ কিছু সোনার গহনা। কিছু দলিল পত্র।

—কিসের দলিল?

—সম্ভবত কোন জমিটমি কেনার দলিল হোতে পারে। আর আছে কিছু কোম্পানির শেয়ার। কিছু পোস্ট অফিসের ফিক্সড্ ডিপোজিট সার্টিফিকেট। কিছু আছে ধার দেওয়ার কবুলতনামা। সেও অনেক টাকার। এই সব আর কি?

—তুমি কিন্তু জমি কেনার দলিল থেকে কিছু খুঁটে নিতে পার।

—কী রকম?

—জমি যে বিক্রি করেছে তার নাম ঠিকানা পেতে পার।

দীপু হঠাৎ বলল,—তাতে লাভ? যে জমি বিক্রি করেছে সে বলবে, জমি বিক্রির পর আর আমার ক্রেতার নাড়ীনক্ষত্র জানার কোন প্রয়োজন নেই।

—ঠিক বলেছ দীপু। তবু বাংলায় একটা প্রবাদ আছে ছাই দেখলে একটু ঘেঁটে দেখা ভাল। সোনা না পেলেও দরকারি কিছু পাওয়াও তো যেতে পারে।

—কথাটা মন্দ বলেননি ম্যাডাম। বিকাশ যোগ করেন, কোথা দিয়ে কি বেরোয় কেই বা বলতে পারে। আমি আরও একজনের কথা বলতে পারি, মানে সন্দেহ করা যেতে পারে, তিনি হলেন মিতা দাস। এবং তিনি মহিলা।

হঠাৎই নীল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল,—নন্দিনী, চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। হয়তো বেশ কিছুদিন তোমার সঙ্গে দেখা নাও হোতে পারে। কেসটা আমাকে ভাবাচ্ছে। এর শেষটা না দেখে—

হাসতে হাসতে নন্দিনী বলল,—নীল ব্যানার্জিকে তো আমি আজ চিনছি না। এগুলো আমার সহা আছে। চল, অন্তত আজকের সন্ধেটা তোমার সঙ্গেই বাড়ি ফেরা যাক।

১৪

মিতা দাসের সঙ্গে দেখা করার আগে ওরা প্রথমেই গেলো সত্যশোভনের থানায়। সত্যশোভন তখন একটা জরুরি কাজে বেরচ্ছিলেন। রাস্তাতেই দেখা। নীলকে দেখে সত্যশোভন একটু উচ্ছ্বাস দেখালেন,—হাই ব্যানার্জি সাহেব, বলুন খবর কি?

—খবর তো আপনাদের কাছে।

—একমাত্র ফোরেনসিক রিপোর্ট ছাড়া আর আমরা কিছুই এগোয়নি। ইদানীং এখানে বড়ো বেশি রকম অ্যান্টিসোস্যালদের উৎপাত বেড়েছে। এই তো সেদিন, খবরের কাগজেও বেরিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলো আজকাল নিজের হাতে শাসন আর বিচারের ভার তুলে নিয়েছে। গত পরশু, পেশায় রিক্সাওয়ালা একজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার বিচার করেছে। গণ আদালতে। গণ আদালতই বটে। কিছু গুণ্ডা আর মাস্তান হচ্ছে সেখানকার গণ বিচারক। আর সেই বিশেষ আদালতের চাঁইটি হচ্ছেন একটি রাজনৈতিক দলের ধ্বজাধারী। বিচারে ছেলেটির মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এবং সেটি কার্যকরও করা হয়। গতকাল বিকেলের দিকে মুণ্ডুকাটা রিক্সাওয়ালার ডেডবডি পাওয়া গেছে বড়পুকুরের ধারে। এবং তারপর সন্দেহজনক চার মক্কেল নিপাত্তা। অবশ্য নেতাটিকে ধরা হয়েছে। সন্দেহক্রমে। তবে ছেড়েও দিতে হবে, কারণ ডাইরেক্ট কোন প্রমাণ নেই। অথচ শুনলাম সেই নরমেধ যজ্ঞে উপস্থিতির সংখ্যা নেহাতই কম ছিল না। কিন্তু এখন তারা নির্বাক হয়ে গেছে। একজন বলল, তার নাকি গলায় ব্যথা। ডাক্তার বেশি কথা বলতে মানা করে দিয়েছেন। গলায় ক্যানসার। অথচ প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন বলে গেছে, সম্ভবত অন্য দলের ছেলে হবে, সে রাত্রে মহান নেতাই বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। আমরা যে কোন্ রাজত্বে বাস করছি সেটা ঈশ্বরও সঠিক বলতে পারবেন না।

দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে সত্যশোভন নীলকে বললেন,—জগৎপ্রিয় থানায় আছে। এই কেসটায় ও নিজেও ইন্টারেস্টেড। আপনি ওর সঙ্গে দেখা করুন। হয়তো কোন সঠিক খবরটবর ও আপনাকে দিতে পারবে। আমি চলি একবার বীরপাড়ার দিকে। কিছু লোক্যাল বীরকে চ্যাংদোলা করে থানায় নিয়ে আসি। তারপর ওপরয়ালার চাপ না থাকলে তখন আমাদের চাপের বহরটা অ্যাপ্লাই করব।

BanglaBook.org

নীলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উনি জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এবং ঠিক তখনই মিতা দাসকে দেখা গেল হনহনিয়ে স্টেশন রোডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সুযোগ ছাড়ার বান্দা নীল নয়। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো মিতা দাসের একেবারে সামনে। মেয়েটির বয়েস যাই হোক না কেন, মুখের লাবণ্যে সেটা বোঝা যায় না। চোখে চতুর চাহনী। শেষ বিকেলের আলোছায়ায় বেশ রহস্যময়ী।

নীল আর দীপুকে দেখে না-চেনা মুখে থমকে দাঁড়াল।

—কি ম্যাডাম, চিনতে পারছেন না?

—না তো, তা, আমায় কি কিছু বলবেন?

—মনে পড়ছে না, তাই না? বেশ আমি মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। 'সৃজনমায়া'র ঘরে আমাদের দেখা হয়েছিল। আপনি তো ওখানকার সভ্যা। তাই না?

—হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। আপনি বোধহয় কোন একটা তদন্তে গিয়েছিলেন?

—এই তো, মনে পড়েছে। কার তদন্ত সেটা ঠিক মনে পড়ছে না, তাই তো।

—আপনি ক্ষণাদির ব্যাপারে গিয়েছিলেন?

—কারেক্ট। আপনার স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর।

—কিন্তু আমি তো আপনাকে সেদিন বলেই দিয়েছি এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, জানাও নেই।

—না ম্যাডাম, আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করছি না। তবে যে প্রশ্নটা আপনার জানা, সেটাই আমি জানতে চাইছি।

—জানা থাকলেও আমি কিন্তু আপনার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই।

নীল সামান্য হাসল। তারপর বলল,—কথাটা আপনি বোধহয় না ভেবেই বলছেন। আমি তো আর পুলিসের লোক নই।

—সেই জন্যেই তো দোব না। পুলিসকে আমরা উত্তর দিতে বাধ্য হই। নইলে ওরা টরচার করতে বাকি রাখে না। বাট. আই অ্যাম নট সাপোজ টু গিভ এনি আনসার টু আ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।

—কিন্তু, আপনার কথাটা ঠিক হলেও. আপনার জানা উচিত ছিল, পুলিসের হাত থেকে হয়তো কখনও সখনও রেহাই পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটররা প্রায় জোঁকের মতো। একবার ধরলে শেষ না দেখে ছাড়ে না।

এরপরই গলার স্বর কিছুটা পাল্টে নীল বলল,—যদি কোন অপরাধ না করে থাকেন, তাহলে আমাদের কাছে সত্যি কথাগুলো বললে আখেরে কাজ দেবে।

বেশ ডাঁটো ভঙ্গিতে মিতা বললেন,—স্যরি, আমি কোন অপরাধ করিনি, কোন অবাঞ্ছিত প্রশ্নের জবাব দিতেও আমি ইচ্ছুক নই।

দুম্ করে নীল সেই অবাঞ্ছিত প্রশ্নটাই করে বসল,—বিশ্বদীপবাবুর সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

—কেন? ওনার সঙ্গে আমার দেখা হবে কেন? কি কারণে?

—বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর দেখা হওয়াটা অনেক সময়ে কারণ না রেখেই হয়।

—স্যরি, মিস্টার। হি ইজ নট মাই ফ্রেণ্ড। জাস্ট একটা আলাপ।

—এবং আলাপটা হয়েছিল ক্ষণপ্রভা দেবীর বাড়িতে তাই না?

—এ রকম সুসংবাদ কে দিল আপনাকে?

—কথাটা সত্যি কিনা সেটাই আগে বলুন?

—অতো আমার মনে নেই। ক্ষণপ্রভাদির বাড়িতে আমাদের যেতে হোত। ক্লাবের কাজে, তাই দেখা হোতে দোষ কোথায়?

—না, দোষ নয়। তবে এটাও আপনারা এড়িয়ে গেছেন, আপনি এবং আপনাদের সেক্রেটারি সাহেব। বিশ্বদীপবাবু আপনাদের ক্লাবে রেগুলার যাতায়াত করতেন। সম্ভবত উনি আপনাদের প্যাট্রন ছিলেন।

মিতা সামান্য থমকে যায়। খানিকটা সময় নেয়। তারপর বলে, না হিসেবটায় সামান্য ভুল আছে। ক্ষণপ্রভাদির সঙ্গে উনি কখনও-সখনও যাতায়াত করতেন। আমাদের ধারণা হয়েছিল উনি হয়তো আমাদের সভ্য হবেন। অবশ্য ক্ষণপ্রভাদি সেই রকমই একটা আভাসও দিয়েছিলেন ক্লাবের কাউকে কাউকে।

—তার মানে সেদিন আপনারা সত্যগোপন করেছিলেন?

—সেদিন কি বলেছিলাম এখন তা মনে নেই।

—বেশ, তা উনি কোথায় থাকেন সেটা বলতে পারবেন?

—না। খবর রাখি না। আমার তাড়া আছে। এবার যেতে হবে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভবিষ্যতে দরকার পড়লে কি আপনার সাহায্য পেতে পারি?

—বললাম তো আমি এসব খুন জখমের ব্যাপারে কিছুই জানি না।

নীল আবারও হাসল। হাসতে হাসতে বলল,—উই ডু নট নো, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উই নো। ঠিক আছে আপনি আসতে পারেন।

মিতা দেবী চলে যেতেই দীপু বলল,—এই মহিলাটি জানেন বিশ্বদীপবাবু কোথায় থাকেন।

—কি করে বুঝলি?

—বিশ্বদীপ প্রসঙ্গ আসতেই মহিলার চোখে মুখে কিছুটা শঙ্কা, কিছুটা অন্য রকমের একটা পরিবর্তন ফুটে উঠছিল। আচ্ছা ক্লাবের কাউকে পাকড়াও করলে হয় না?

—সাধারণত কোন মানুষই চায় না চট্ করে উড়ো ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে। চল দেখি একবার স্বপ্নাদের বাড়ি যাওয়া যাক। ওর কাছে কোন খবর আছে কিনা সেটা একটু জানা দরকার।

—থানায় যাবে না? তোমার জগৎপ্রিয় বাবুর সঙ্গে কোন দরকার নেই?

—একবার পি: এম. রিপোর্টটা দেখা দরকার। রজতশীর্ষর পেটে কি শুধুই অ্যালকোহল ছিল নাকি আরও বিশেষ কিছু।

—তার মানে তুমি বলতে চাইছ আগে মার্ডার পরে সুইসাইড বলে সাজানো কিনা?

—কিছুই বলতে চাইছি না। এখন শুধু জানার সময়। আসলে আমরা কেউ রজতশীর্ষবাবুর লাশ দেখিনি। লাশ দেখেছে শ্যামচ্যাঁদ। সে আবার রজতশীর্ষকে আগে দেখেনি। সে কেবলমাত্র দেখেছে ধড় মুণ্ড আলাদা হয়ে যাওয়া একটা বডি। ইভন্ বডিটা আইডেন্টিফাই কেউ করেনি। ওর স্ত্রী আগেই মৃত। সৃজনমায়ার কেউই রজতের বডি দেখেনি।

—তাহলে বুঝবো কি ভাবে ওই বডিটা রজতশীর্ষবাবুর।

—পার্সের মধ্যে একটা ভিজিটিং কার্ড ছিল। যেটা ওর পকেটে পাওয়া গিয়েছিল।

—তার মানে তুমি বলছ, সবটাই ধরে নেওয়া হয়েছে। ভিজিটিং কার্ডটা রজতশীর্ষর হোতে পারে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি অন্য কেউ হোতে পারে না?

—তাই তো সবগুলিয়ে যাচ্ছে। হিসেবে আসছে না। এমন কি রজতবাবুর গায়ে যে সমস্ত জামাকাপড় ছিল, সেটা যে আদপেই রজতশীর্ষর তাও কিন্তু কেউ আইডেন্টিফাই করেনি। একমাত্র একটা বাচ্চা আনাজওয়ালা বলছে ও বাবুকে চেনে। কিন্তু ওই বাবুই যে রজতশীর্ষ সেটা তো হলফ করে বলতে পারবে না।

—তাহলে কি তুমি বলতে চাইছ, বডিটা রজতশীর্ষর নাও হোতে পারে?

—না রে, আমার এখন কোন কিছুই বলার দিন আসেনি। আসলে যতক্ষণ না বিশ্বদীপকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

কথায় কথায় ওরা চলে এসেছিল স্বপ্নাদের বাড়িতে। কড়া নাড়তে স্বপ্নাই দরজা খুলে দাঁড়ালো। একগাল হেসে স্বপ্না বলল,—সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল আজ আপনারা আসতে পারেন।

—চা খাওয়াবে তো, নাকি?

—কি যে বলেন দাদা। আসুন, ভেতরে আসুন। একটা সুখবর দোব।

—সেইজন্যেই তো আরো আসা।

শ্যামচাঁদের রোজগার তেমন না হলেও স্বপ্নার হাতের ছোঁয়ায় ঘরদোরের মধ্যে একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। সবই বেশ পরিপাটি করে সাজানো এবং পরিচ্ছন্ন। যদিও সেগুলো কোনটাই মূল্যবান আসবাব নয়। পরিস্কার চেয়ারে বসতে বসতে নীল বলল,—বলো তো তোমার সুসংবাদটা কি?

—বলছি। আগে চা-টা করে নিয়ে আসি, তারপর।

মিনিট তিনচারেকের মধ্যেই চা আর কিছু বিস্কিট এসে গেল। বিস্কিট ছেড়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে নীল বলল,—বল, তোমার সংবাদটা না শোনা পর্যন্ত আই অ্যাম ওরিড।

—আপনি সেদিন চলে যাবার পর থেকে আমি বা শ্যাম কেউই বসেছিলাম না। আপনি বলেছিলেন বিশ্বদীপের খবর নিতে আর মিতার পিছনে ফেউ হোয়ে ঘুরতে।

—এবং তোমরা সেটি করেছ?

—হ্যাঁ দাদা। সৃজনমায়ার একটি ছেলের সঙ্গে শ্যামের সামান্য আলাপ ছিল। সেই জানালো অনেক কিছু।

—কি রকম?

—প্রথমটায় বলতে চায়নি। তারপর বাড়িতে ডেকে এনে আমার কিছু স্পেশ্যাল রেসিপি পেটে পড়তেই—

—কি বলল?

—বিশ্বদীপ লোকটা ভালো লোক নয়। সেটা অবশ্য ওপর থেকে বোঝা যায় না। লোকটার সঙ্গে ক্ষণপ্রভা নন্দীর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। এমনকি রেগুলার ওদের বাড়ি যেতেন ইন অ্যাবসেন্স অব রজতশীর্ষ নন্দী।

—হ্যাঁ, এ খবরটা আমরা পেয়েছি, দীপু বলল।

—কিন্তু তাতে করে লোকটা খারাপ এটা বলা যায় না। নীল যোগ করল।

—আগে সবটা শুনুন। ক্ষণপ্রভা নন্দীকে খুবই গুণী মহিলা বলা যেতে পারে। বহু কালাচারাল প্রোগ্রামের সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন। ডান্স এবং ড্রামা

অ্যাকটিং-এ ওনার বেশ নামডাক। উনি নিহত হবার পর কাগজে, টিভিতে ওঁর মৃত্যুসংবাদ বেরিয়েছে।

দীপু বলল,—হ্যাঁ সেগুলো আমরা লক্ষ্য করেছি। সেই জন্যেই তো ওনার মৃত্যুরহস্যের হদিশ পাওয়ার দরকার।

—সেটা অবশ্য, একটু থেমে স্বপ্না বলল, পুলিস এবং আপনাদের কাজ, কিন্তু যে কোন মিস্‌হ্যাপ, সে সুইসাইডই বলুন বা হোমিসাইডই বলুন, বিনা কারণে কিন্তু হয় না।

—কারণ কিছু জানতে পেরেছ স্বপ্না?

—দুটো কারণ আমি গেইস করছি। জানি না আপনারা ঠিক কি বলবেন, ক্ষণপ্রভা দেবীর লাইফ স্টাইলটা কিন্তু খুব একটা সুবিধের ছিল না। অ্যাটলিস্ট আমরা যারা লোয়ার মিড্‌ল ক্লাশ ফ্যামিলিতে অ্যাকাস্ট্যামড্‌, আমাদের সঙ্গে মেলে না।

—তুমি কি মিন করছ?

—ক্ষণপ্রভার অনেক বয়ফ্রেণ্ড ছিল। এবং বদনামও ছিল।

—সেটা কি ওই ছেলেটি বলেছে?

—শুধু ও একা নয়। ওদের বাড়ির ঠিকে কাজের বউটিও একই কথা বলেছে।

—ঠিকে কাজের মেয়েটি থাকে কোথায়?

—আমাদের বাড়ির পিছন দিকে একটা সেমিবস্তি টাইপ কিছু ঘর আছে। ভূতোর মা ওখানেই থাকে। সেই অনেক কিছু জানায়। বিশ্বদীপ ছাড়া আরও একজন মাঝে মাঝে আসতো।

—তিনি কিনি? ভূতোর মা কিছু বলেনি।

—ভূতোর মা তাকে চেনে না।

—দেখতে কেমন কিছু বলেছে।

—লম্বা চওড়া শক্ত সমর্থ লোক। মুখে ঘন দাড়ি আছে।

দীপু বলল,—লোকটা সেই বিশ্বদীপ ঘোষ নয়তো?

মাথা নাড়তে নাড়তে নীল বলল,—সেটা আর কি করে বলা যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি ভূতোর মা জানে, অথচ নিশুতি কোন খবর রাখে না। এমনটা কি করে হয়? এনিওয়ে, অ্যাকর্ডিং টু ভূতোর মা অ্যাণ্ড দ্যাট ম্যান অব সৃজনমায়া, তারা একই কথা বলছে। এবং ক্ষণপ্রভাদেবী সম্বন্ধে। আই থিঙ্ক, মিতা দেবী বা

ওদের সেক্রেটারিও ওর ফাস্ট লাইফ সম্বন্ধে জানতেন, কিন্তু ভাঙেননি। এনিওয়ে, ওদের মধ্যে আই মিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি কোন পারবারিক অশান্তি ছিল? মানে ক্ষণপ্রভা দেবীর এই ধরনের জীবনযাপনের জন্যে?

স্বপ্না বলল,—সেটা তেমনভাবে কেউ বলেনি। হয়তো ওরা একটা কামোফ্লেজের আড়ালে বাস করতো, হয়তো সেটাই অ্যাডজাস্টমেন্ট। এখানে আরও একটা কথা, যেটা আমার ধারণা, দুজনে সম্ভবত কমপ্রোমাইজের রাস্তায় চলতো।

—কমপ্রোমাইজ? কী রকম?

—রজতশীর্ষবাবু সম্বন্ধে আপনারা তো অনেক খারাপ রিপোর্ট পেয়েছেন?

—তুমি জানলে কি করে?

—আপনারা কি জেনেছেন সেটা আমি জানি না, কিন্তু মাত্র আট ন'মাস ওরা এখানে এসেছে। এরই মধ্যে যে ভাবে ক্লাবের জন্যে টাকাকড়ি খরচ করেন সেটা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তখনই এখানকার মানুষের মধ্যে একটা সন্দেহ দেখা দেয়। তার ওপর শুনেছি উনি ব্যাঙ্কের চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ তাই।

—তাহলে? হয়তো ভি. আর. নেবার জন্যে অনেক টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তো ওড়াবার জন্যে নয়।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল,—তোমার কথায় যুক্তি আছে। পরিশ্রমের টাকা এমনভাবে কেউ ওড়ায় না। তার মানে ইনকামের অন্য কোন রাস্তা আছেই।

—সেটাই আমার বক্তব্য। উড়িয়ে পুড়িয়েও ঘর থেকে অনেক নগদ টাকা পাওয়া গেছে। অর্থাৎ ওনার দুনম্বর পথের রোজগার হয়তো ক্ষণপ্রভা দেবীর ভালো লাগেনি। যেমন নানা পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা রজতবাবুর পছন্দ ছিল না। কমপ্রোমাইজ এটাই। যে যেমন চলার চলবে। কেউ কারোর ব্যাপারে নাক গলাবে না। আর কামোফ্লেজ হচ্ছে বাইরে ওরা শালিকজোড়।

—বেশ তাই যদি হয় তাহলে দুটো মৃত্যু কেন ঘটবে একই দিনে? তার মানে এখানে কোন তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশের ছায়া দেখা যাচ্ছে। সেটি বিশ্বদীপ হতে পারে আবার অন্য কেউও হতে পারে।

—বিশ্বদীপের কোন খবর পেয়েছেন?

—নাহ্।

হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। স্বপ্না একটা টুলে বসেছিল। বোধহয় ও এসেছে। বলে স্বপ্না উঠে গেল। একটু পরে ফিরে এলো শ্যামচাঁদকে নিয়ে।

এখন শ্রাবণ মাস। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার থামলেই গরম বাড়ছে। শ্যামচাঁদ বেশ ঘেমে এসেছে। আজ একটু তাড়াতাড়িই ফিরেছে।

ও ওই অবস্থায় বসতে যাচ্ছিল। নীলই বাধা দিল,—শ্যামচাঁদ তুমি আগে হাতমুখ ধুয়ে এসো। তোমাকে খুব টায়ার্ড লাগছে।

কিছু না বলে শ্যামচাঁদ বেরিয়ে গেল এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে ফিরে এল।

—বিশ্বদীপের কোন খবর পেলে শ্যামচাঁদ?

—কি করে পাব? তাকে তো আমি কোনদিন চোখেও দেখিনি।

—কিন্তু লোকটাকে তো চাই।

—অবশ্য যদি বেঁচে থাকে।

—গতকাল এক মহিলা ফোন করে আমাকে থ্রেট করে। যেন এই কেসটা থেকে আমি সরে দাঁড়াই। আর বিশ্বদীপের কথা জানতে চাইলে মহিলা জানান আমি যদি বেশি বাড়াবাড়ি করি তাহলে বিশ্বদীপকে মেরে ফেলতে তারা পিছপা হবে না। তার অর্থ বিশ্বদীপের কাছে টোটালি রহস্যের জটটা রয়ে গেছে।

স্বপ্না আবার একটা বুদ্ধিমতীর মতো প্রশ্ন করল,—মহিলা কি দাদা আপনাকে মোবাইলে ফোন করেছিল?

—হ্যাঁ, সেখানেও নিজেকে চালাক প্রতিপন্ন করার জন্যে বলেছিল, আমার মোবাইলে যে নাম্বারটা ভিউ স্ক্রীনে পাওয়া যাবে সেটা একটা পিসিও বুথের নাম্বার।

—এ মহিলাটি কে?

—জানা যায়নি।

—তাহলে এখন কি করবেন?

—কেবল আগামী ঘটনা, যদি আদপেই ঘটে, তার দিকে চোখ রাখা। আর বিশ্বদীপকে খুঁজে পাওয়া। কিন্তু বিশ্বদীপের কোন ছবি আমার কাছে নেই।

হঠাৎ স্বপ্না বলল,—ক্ষণপ্রভাদির শুনেছি বেশ সাজানো ফ্ল্যাট। আপনাদের উচিত আরও কয়েকবার গিয়ে অনুসন্ধান করা। যদি বিশ্বদীপ ক্ষণপ্রভা দেবীর শেষ প্রেমিক হয় তাহলে নিদেন পক্ষে একটা ছবি কি থাকবে না?

—ইউ আর রাইট স্বপ্না। বলেই নীল মোবাইলে বড়পুকুর থানায় রিং করল। ফোন ধরল জগৎপ্রিয়। নীল নিজের পরিচয় দিতেই জগৎপ্রিয় বলল—মিস্টার ব্যানার্জি। আপনার কথাই ভাবছিলাম। প্লীজ একবার থানায় আসবেন? আপনাকে কয়েকটা ইনফরমেশন দেবার আছে।

—আমি আসছি এখুনি।

দীপুর উদ্দেশ্যে নীল বলে,—চল দীপু। একবার থানায় যেতে হবে। ওখান থেকে জগৎপ্রিয়কে নিয়ে আরও একবার সাজানো ক্ষণপ্রভা অ্যান্ড রজতশীর্ষর ফ্ল্যাটটা চিরুণী দিয়ে আঁচড়াবো। মনে হয় এখনও অনেক কিছু ওখানে খুঁজলে পাওয়া যাবে।

১৫

চেয়ারে বসতে না বসতেই জগৎপ্রিয় বলল,—রজতশীর্ষর বাড়ি থেকে ওর বৃদ্ধ বাবা এসেছিলেন থানায়।

নড়েচড়ে বসল নীল,—রজতবাবুর বাবা? কী বলছেন তিনি?

—চলুন না, ওর সঙ্গে দেখা করি। আপনি আপনার মতো গুছিয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন।

—ভদ্রলোক এখন কোথায়?

—লোক্যাল একটি হোটেলে উঠেছেন। স্টেশন রোডের ধারেই। যাবেন তো চলুন।

—ওহ্ সিওর। কিন্তু নন্দীদের চাবিটা একবার নিতে হবে। ঘরটা আবার দেখব।

—ঠিক আছে। আমি নিয়ে নিচ্ছি।

—সত্যশোভনবাবু কোথায়?

—বীরপাড়ার দিকে আবার ঝামেলা শুরু হয়েছে। যে লীডারটিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তার জন্যে ওরই দলের লোকজন বারো ঘণ্টার বনধ ডেকেছে। তাই নিয়ে বীরপাড়া বেশ উত্তপ্ত। অফিসার হিসেবে উনি এখন ওখানেই।

—ঠিক আছে, চলুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা গিয়ে দাঁড়ালো হোটেল বাড়িটার সামনে। জগৎপ্রিয় ওদের নিয়ে সোজা দোতলায় চলে এল। একেবারে শেষের দিকে সিঙ্গল বেডেড রুম। রুমের কলিং বেলে পুশ করতেই এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দরজা খুললেন।

BanglaBook.org

ভদ্রলোকের বয়েস সত্তরের কাছে। গায়ের রঙ পরিষ্কার। পরিধানে দামি ধুতি পাঞ্জাবি। জগৎপ্রিয়কে দেখে জিগ্যেস করলেন,—পেলেন, রজতের কোন খবর?

জগৎপ্রিয় বললেন,—ঠিকানা না রেখে যে চলে যায়, তাকে কি আর পাওয়া যায়?

বৃদ্ধ নীরেনবাবু, মানে রজতশীর্ষর বাবা ওদের ডেকে নিয়ে ঘরে বসালেন। জগৎপ্রিয় নীলের সঙ্গে ওনার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

প্রতিনমস্কার করতে করতে নীল বলল,—রজতবাবুর খবরটা নিশ্চয় শুনেছেন?

—হ্যাঁ, কাগজে পেয়েছি। কিন্তু এটা আমি বিশ্বাস করি না। রজত আত্মহত্যা করতে পারে না।

—কিন্তু তার লাশ পাওয়া গেছে।

—খবরের কাগজ লিখছে তার মুখ থেঁতলে গেছিল। তাহলে আপনারা চিনবেন কি করে? সেটা তো অন্য কারো দেহ হোতে পারে।

—কাছেই রজতবাবুর পার্স ছিল।

—তবু আমি বিশ্বাস করি না। এমনও তো হোতে পারে তার পার্স পকেটমার হয়ে গেছিল। তার হাতের লেখায় কোন সুইসাইড নোট আছে?

—না, তেমন কিছু পাইনি। কিন্তু সে সুইসাইড করবে না এটা আপনার বিশ্বাস, কেন?

—ওর চোখে বড়লোক হবার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নের টানে, আমি জানি, রজত অনেক অপরাধ করেছে। কিন্তু সুইসাইড? অত দুর্বল মনের ছেলে ও নয়।

—আর আপনার বউমা? তাঁকে তো মার্ডার করা হয়েছে।

মুখে তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে নীরেনবাবু বললেন,—ওর কথা আমায় জিগ্যেস করবেন না। এ বিয়ে আমি মানি না। তাছাড়া যাকে আমি পুত্রবধূ বলে স্বীকার করিনি, তার ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

—কিন্তু তিনি আপনার পুত্রবধূ। আইনত।

—কুলাঙ্গার। দুটোই। কেননা আইনত এ বিয়ে অসিদ্ধ। নিজের মাসতুতো বোনকে বিয়ে করাটা আমি কোন মতেই সাপোর্ট করি না। এবং আপন মাসতুতো বোনকে বিয়ে করা আইনত অপরাধ।

—মাসতুতো বোন?

—হ্যাঁ, আমার ছোট শালীর মেয়ে। অপদার্থ। বোথ অব দেম। অথচ—

নীরেনবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন ক্ষণিকের জন্যে। ওঁকে লক্ষ্য করতে করতে নীল বলল,—থামলেন কেন? আপনি কি বিশেষ কিছু বলতে চান?

ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীরেনবাবু বললেন,—অথচ আমি শুনেছিলাম অন্যরকম!

—সেটা কি?

—সোমা, মানে আমার ছোট শালী আর একটি ছেলের কথা শুনিয়েছিল। যদিও ছেলেটিকে সোমার তেমন পছন্দ ছিল না। সামান্য চাকরি করতো। পুলিস লাইনে। কতই বা মাইনে পেতো। যেটা ওদের স্টেটাসের সঙ্গে কিছুতেই মেলে না। ক্ষণপ্রভা ছিল ট্যালেন্টেড মেয়ে। নাচ, গান, অভিনয় সব ব্যাপারেই পারদর্শিনী। আমরা ভাবতাম মেয়েটা একদিন খুব নাম করবে। কিন্তু সেই মেয়েটিই একটা সামান্য ছেলেকে ভালবাসল। তারপর তাকে বিয়ে করার জন্যে বাড়িতে তুমুল কাণ্ড। সোমা আর সোমার বর তো রীতিমতো ভেঙে পড়েছিল।

—সে ছেলেটিকে আপনি দেখেছিলেন?

—না, সে সুযোগ পাইনি। সোমাকে আমি বলেছিলাম, মেয়ে যখন ভালই বেসেছে, তখন অভিভাবকদের কিছু নরম হোতে হয়। আমি সেই কারণেই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই সব ওলটপালট হয়ে গেল। সর্বনাশটা যে আমার ঘরেই বাসা বেঁধেছে তা আর বুঝব কেমন করে? একদিন হঠাৎ রজত ক্ষণপ্রভার হাত ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল ও নাকি তাকে বিয়ে করেছে।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরেনবাবু মাথা নীচু করলেন। সম্ভবত প্রচণ্ড রাগ, বিরক্তি আর অপমানে।

কিছুক্ষণ পর নীল জিগ্যেস করল,—সেই ছেলেটির ব্যাপারে আর কিছু প্রশ্ন করেননি?

—কি হবে? তখন তো আমার ঘরে আগুন লেগে গেছে। রজতের মা খবরটা শুনেই শয্যাশায়ী। আর আমি গৃহবন্দী। আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি-গুষ্টি কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি না। আমাদের বনেদি বংশে এমন ঘটনা কখনও কেউ ভাবেনি।

—আর রজতবাবু?

—তখন সে একটা ব্যাঙ্কের অফিসার। রজতকে আমি বলেছিলাম এ বিয়ে অসিদ্ধ। আমি কোর্টে গিয়ে নালিশ জানাবো যাতে এ বিয়েকে নাল অ্যাণ্ড ভয়েড

BanglaBook.org

করা যায়। রজত আমার কথায় কান দেয়নি। সে বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রায় একবস্ত্রে, ক্ষণপ্রভাকে নিয়ে। তারপর থেকে আর কোন যোগাযোগ নেই। বলতে পারেন যোগাযোগ রাখিনি। তবে যাবার সময় বলে গিয়েছিল, জীবনে সে কোনদিনও হারেনি। হারার কথা ভাবেও না। হাজার বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে সে তার জয় হাসিল করে আনবে। যেমন ক্ষণপ্রভা। প্রায় অসম্ভবকেও সে তার গোঁয়ার্তুমি দিয়ে সম্ভব করে তুলেছিল।

—তাই আপনার ধারণা রজত আত্মহত্যা করতে পারে না?

—হ্যাঁ তাই। তার নামে কিছু বদনাম শুনলেও, শুনেছি সে নাকি প্রচুর টাকা করেছিল। আবার এও শুনেছি তার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেণ্ট আছে। পুলিস নাকি তার ঘর সার্চ করে অনেক টাকাকড়ি পেয়েছে।

—হ্যাঁ পেয়েছে। আপনি কি সেগুলো ক্লেইম করবেন? বাবা হিসেবে করতে পারেন।

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরেনবাবু বললেন,—আমার স্ত্রী, মানে রজতের মায়ের কঠিন অসুখের সময়েও, তার একটা টাকাও আমি হাতে ছুঁইনি। একদিনের জন্যেও বলিনি আমাদের কোন টাকার দরকার। আজ আমি জানি না সে আছে কি নেই। কিন্তু তার কোন সম্পদেই আমার কোন দাবি নেই। ওসব ছুঁতেও ঘেন্না করবে। যাই হোক, তার দেহ তো পুলিস আনক্লেইমড্ বডি হিসেবে পুড়িয়ে ফেলেছে। আমার পক্ষেও আর বলা সম্ভব নয় যে মারা গেছে সে রজত কিনা। বড় দেরি হয়ে গেল আসতে। আসলে আমি সত্যিটা জানতে এসেছিলাম।

—এখন কি করবেন?

—ফিরে যাব। রজতের মা হয়তো ছেলেকে ক্ষমা করেছে। হয়তো আমার শালীও। তাদের কাছে গিয়ে বলবো, দুজনের কেউই আর তোমাদের কাছে ফিরে আসবে না। এ একদিকে ভালই হোল। আমি প্রাচীনপন্থী মানুষ। এইসব জটিল এবং অবৈধ বন্ধনগুলো যত তাড়াতাড়ি শেষ হোয়ে যায় ততই ভালো। ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ ওদের কোন সন্তান হয়নি।

দীপু আর জগৎপ্রিয় এতোক্ষণ একটাও কথা বলেনি। বলার কিছু ছিলও না। কেবল জগৎপ্রিয় জিগ্যেস করল,—মিস্টার নন্দী, অভিমান করে আপনি হয়তো রজতবাবুর কোনকিছুই স্পর্শ করবেন না। ঠিকই। কিন্তু একটা কাজ করলে সম্পত্তির একটা সুরাহা হয়।

কিছু না বলে নীরেনবাবু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জগৎপ্রিয়র দিকে তাকালেন। জগৎপ্রিয় বলল,—ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে অনেক টাকা পাবেন। এছাড়া নগদে এবং

সোনাদানায় যা পাওয়া গেছে আনক্লেইম্‌ড্‌ প্রপার্টি হিসেবে এখনও ডিক্লেয়ার্ড হয়নি। আপনি ইচ্ছে করলে সেগুলো কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিতে পারেন।

সজোরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধ বলেন,—না বাবা, সে আমি করতে পারি না। যতদূর শুনেছি, বহু লোকের চোখের জল মিশে আছে ওই সম্পত্তিতে। বরং সরকার নিজে দায়িত্ব নিয়ে যাদের যা পাওনা সেগুলো যতটা সম্ভব মিটিয়ে দিলে ওদের আত্মা শান্তি পেতে পারে। আপনারা আমাকে এই সব বিসদৃশ অবস্থা থেকে মুক্তি দিন।

উঠতে উঠতে নীল কেবল একটা প্রশ্ন করল,—মিস্টার নন্দী, আপনি কি বিশ্বদীপ ঘোষ বলে কারো নাম শুনেছেন?

—কে বিশ্বদীপ ঘোষ?

—মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস নন্দীর বিশেষ বন্ধু।

—মাফ করবেন। রজত আর ক্ষণপ্রভার কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেই আমার কোন পরিচয় ছিল না। নেইও।

—ঠিক আছে। আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

১৬

বাইরে বেরিয়ে এসে জগৎপ্রিয় বলল,—ক্ষণপ্রভাদেবী দেখছি এককথায় মক্ষীরানী ছিলেন। ছোট বেলায় এন্তার ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছেন।

বাধা দিয়ে নীল বলল,—আপনি কি করে জানলেন ছোটবেলায় উনি এন্তার ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছিলেন?

—না মানে, নীরেনবাবুর কথা থেকে যা বোঝা যায়। সে যাই হোক, রজতবাবুকে বিয়ে করার আগে একজনের সঙ্গে প্রেম করেছিলেন, তাকে বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন, কিন্তু বিয়ে করলেন রজতবাবুকে। সেটাও আবার ইল্লীগ্যাল বিয়ে। এখন তো নানাভাবে জানা যাচ্ছে তিনি একজন স্ক্যাণ্ডালাস মহিলা। স্বামী থাকতেও তাঁর অনেক বয়ফ্রেণ্ড ছিল। এসব মেয়েরা বোধহয় এইভাবেই মরে।

মাথা নাড়াতে নাড়াতে নীল বলল,—হুঁ, কিন্তু মহিলা খুন হলেন কখন? নিশুতির ভারসান অনুসারে রজতশীর্ষ আর ক্ষণপ্রভা সারাদিন বাড়িই ছিলেন। রজত বাড়ি থাকতেই পারেন। কারণ তখন তার চাকরি নেই। তাহলে কি ধরে নিতে হবে রজতবাবুই তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছিলেন?

—মোটিভ, জগৎপ্রিয় জিগ্যেস করে, মক্ষীরানীকে কি আর সহ্য হচ্ছিল না?

—হতেও পারে। ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে উনি হয়তো আর সহ্য করতে পারছিলেন না।

—একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আরও একটা কথা, সেদিন ফ্ল্যাটে আরও একজন ছিলেন।

—বিশ্বদীপ ঘোষ?

—নাও হোতে পারে। অন্য কেউ কি হোতে পারে না? যদিও সামনের ফ্ল্যাটের মহিলা বলছেন তিনি বিশ্বদীপকে দেখেছেন।

—বাই দ্য বাই, ক্ষণপ্রভার মৃত্যুটা ঠিক কটার সময় হয়েছে? পি. এম. রিপোর্ট কি বলছে?

—পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে বিকেল তিনটে থেকে সন্ধে ছটার মধ্যে।

—আর রজতবাবুর মৃত্যু?

—রাত আটটা থেকে রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে।

—ওই সময় কি কি ট্রেন যাতায়াত করে?

—সে অনেক। আপলাইনে বডি পাওয়া গেছে। ওই সময়ের মধ্যে মেল ট্রেন আছে কয়েকটা আর লোকাল ট্রেন তো অনেক। অবশ্য পারটিকুলার কোন্ ট্রেন, সেটা কি খুব ভাইট্যাল ব্যাপার?

—না, সেটা হয়তো খুব ভাইট্যাল নয়। কিন্তু ক্ষণপ্রভার মার্ডার হওয়া আর রজতশীর্ষর মৃত্যু, এ দুটো ধন্দে ফেলছে। যদি রজতশীর্ষ তার স্ত্রীকে খুন করে থাকে, মানে তিনটে থেকে ছটার মধ্যে, তাহলে অঙ্ক মিলছে না। ঊর্মিলা দেবী বলছেন বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ তিনি রজত আর বিশ্বদীপকে বেরতে দেখেছেন। আবার হৃদয়হরণবাবু বলছেন তিনি ছটা নাগাদ রজতকে বাড়ি ফিরতে দেখেছেন। অ্যাণ্ড নিশুতি বলছে, সিনেমা দেখে ফিরে আসার পর সন্ধে ছটা নাগাদ তাকে রজত ডেকে সিগারেট কিনতে দেয়। তাহলে সে খুনটা করল কখন? হয় তাকে তিনটের সময় বাড়ি ফিরতে হয়েছে, এবং খুন করে আবার বেরতে হয়েছে এবং ছটায় হৃদয়হরণবাবুর সামনে দিয়ে বাড়ি ঢুকতে হয়েছে। তারপর নিশুতিকে দিয়ে সিগারেট আনিয়েছে এবং ভরপেট মদ খেয়েছে এবং রাত আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেললাইনে গিয়ে মাথা দিয়েছে। আবার রজতের পি. এম. রিপোর্ট বলছে পেটে মদ ছাড়াও রগের পাশে জোরালো আঘাত ছিল। সম্ভবত সেটাই মৃত্যুর কারণ। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রে দীপু।

—এতে তো কিছু গোলমালের ব্যাপার দেখছি না স্যার, জগৎপ্রিয় বলল, আপনার হিসেবটা ঠিকই আছে। রজতশীর্ষ ডিটারমিন্‌ড্ ছিল সে তার বউকে

মারবে। তাই তাকে কয়েকবার যাতায়াত করতে হয়েছে। সেটা লোক দেখানো হোতে পারে।

—না মিস্টার কর, খুনি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অনেক অ্যালিবাই তৈরি করে, রজত কেন করতে যাবে? সে তো পরে সুইসাইড করার জন্যে রেললাইনে গিয়েছিল।

—কিন্তু স্যার, একটা জিনিস মনে রাখবেন, মানে একটু আগে আপনিই বলেছেন, রগের পাশে জোরালো আঘাতটাই তার মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ।

—ইয়েস, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। রজত সুইসাইড করেনি। তাকে কেউ মেরেছে। সুইসাইড বলে সাজানো হয়েছে।

—আর ক্ষণপ্রভা মার্ডার? তাহলে সেটা কি অন্য কেউ করেছে?

—প্রবলেম সেখানেই। অন্য কেউ মার্ডারার হলে তাকে তিনটে থেকে ছটার মধ্যে মার্ডার করে ফিরে যেতে হবে। এবং সেটা খুবই রিস্‌কি ব্যাপার। যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

—আচ্ছা স্যার, এমনকি হতে পারে না, খুনটা রজতবাবুর ইচ্ছানুসারেই হয়েছে।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন রজতই তার বউকে খুন করিয়েছে কোন ভাড়াটে খুনি দিয়ে?

—হয় না?

—বেশ। আপনার কথা মেনে নিয়েই বলছি, ভাড়াটে খুনি খুন করে চলে গেল। তারপর ছটার সময় রজত বাড়ি ফিরল। দেখল তার বউ মরে পড়ে আছে। তাহলে সে কেন সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে জানাবে না? কেন সে চুপচাপ বাড়িতে থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে বসে বসে মদ খাবে এবং আটটায় ঘরে তালা ঝুলিয়ে সুইসাইড করার জন্যে পকেটে সাড়ে ছ হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাবে?

—আচ্ছা নীলদা, দীপু বলল, এমন কি হতে পারে না, রজতবাবু এমোশনালি বা বউয়ের স্বেচ্ছাচারিতায় মরিয়া হয়ে ক্ষণপ্রভা দেবীকে খুন করিয়েছে। তারপর অনুশোচনায় নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে সুইসাইড করার ডিসিসন নিয়েছে।

—ভালো কথা। কিন্তু যে লোক সুইসাইড করতে যাবে তার পকেটে অতোগুলো টাকা কেন থাকবে? কেন তার রগে প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন থাকবে?

—হয়তো খুনিকে তার প্রাপ্য মেটানোর জন্যে টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল।

—সাড়ে ছ হাজার টাকার জন্যে একজন খুনি অতো রিস্‌ক্ নেবে?

BanglaBook.org

—নিতেই পারে। যা বাজার পড়েছে। সামান্য কিছু টাকার জন্যে মানুষ অনেক কিছু করে ফেলে।

—অতি উত্তম কথা। তা, খুনি টাকা পাবার আগেই, অন্য কেউ একজন এসে রজতের রগে ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করে এবং তাতে রজতের জ্ঞান হারায়, অথবা মারা যায়। তারপর তার দেহটা নিয়ে রেললাইনে শুইয়ে দিয়ে আসে। তার মানে রজতের কোন শত্রু ওৎ পেতে বসেছিল রেললাইনের ধারে? অর্থাৎ সে জানতো রজত ওই সময় ওখানে যাবে?

—দ্যুর বাবা, আমার মাথায় আর কিছু ঢুকছে না, বলে দীপু একটা সিগারেট ধরালো।

—আমারও সব খেই হারিয়ে যাচ্ছে। দীপুবাবু আপনার একটা সিগারেট দিন তো, আমার প্যাকেট ফুরিয়েছে, বলে জগৎপ্রিয় হাত বাড়াল।

ওদের দেখাদেখি নীলও একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল,—আসলে এই জোড়া মৃত্যুতে সবই সম্ভব, সবই অসম্ভব। আসল সত্যিটা বড়ো অদ্ভুতভাবে লুকিয়ে আছে। এবং ঠিক কোন ফোকরে লুকিয়ে আছে সেটাই খুঁজে বার করতে হবে। আসলে মিসিং লিঙ্কটাই চোখে পড়ছে না। মিস্টার কর, ওদের ফ্ল্যাটের চাবিটা এনেছেন তো?

—হ্যাঁ, এনেছি।

—চলুন, ওখানেই যাওয়া যাক। অকুস্থলটাকে তন্নতন্ন করে আঁচড়ে দেখতে হবে।

রাস্তায় আর কোন কথা হোল না। একসময়ে ওরা গিয়ে দাঁড়াল আশ্রয় আবাসনের সামনে। এখন রাত প্রায় নটা। গরমের দিন হোলেও এখন শ্রাবণ মাস। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছে। বিকেলের দিকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হোয়ে গেছে। আশ্রয় আবাসনের সামনে দিয়ে মোটামুটি গাড়ি, বাস, রিক্সা চলাচল করে। এখন খুব একটা বেশি চলছে না। জগৎপ্রিয় এগিয়ে গিয়ে আশ্রয়-এর লোহার গেটে হাতের লাঠিটা দিয়ে বার কয়েক আওয়াজ করল। বোধহয় নিশুতি শুয়ে পড়েছিল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে হাজির।

—স্যার, আপনি?

—কেন? তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে নাকি?

—কী যে বলেন স্যার। আসুন, ভেতরে আসুন। তা স্যার, কিছু সুরাহা হোল? মানে খুনিটুনিকে ধরতে পারলেন?

—ধরা যখন পড়বে তখন দেখতেই পাবে।

ততক্ষণে নীল আর দীপু এসে পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওদের দুজনকে দেখে নিশুতি ফিরে যাচ্ছিল। নীল জগৎপ্রিয়র দিকে তাকিলে বলল,—মিস্টার কর, আপনি বরং গিয়ে দরজাটা খুলুন। আমরা আসছি।

—ওয়েল মিস্টার ব্যানার্জি, আপনারা আসুন।

জগৎপ্রিয় ওপরে উঠে যায়। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীল প্রায় বিড়বিড় করল, নীরেনবাবু হঠাৎ একটা কথা বলে ফেললেন। খুব ইমপর্ট্যান্ট কথা। জগৎপ্রিয় বোধহয় কথাটা ঠিক খেয়াল করেনি।

পাশ থেকে দীপু বলল,—গুরু, আমিও খেয়াল করিনি। কথাটা কি?

—একটা কথা। অজস্র কথার মধ্যে একটা মামুলি কথা। অনেক সময় অনেক মামুলি কথা, কি মামুলি কিছু সূত্র অনেক গভীর কিছুর সংকেত দিয়ে যায়। সেটাকে কেবল ঠিক সময়ে ধরে নিতে হয়।

—কথাটা বলবে কি? নাকি হেঁয়ালি করবে?

—আপাতত হেঁয়ালিই থাক। আগে ভেবে দেখি তার মধ্যে কতটা নেওয়া যায় বা কতটা ফেলা যায়।

ওদের কথার মাঝেই নিশুতি তার ঘরে চলে গিয়েছিল। পারতপক্ষে নিশুতি পুলিস বা পুলিসের সঙ্গে ওঠাবসা আছে এমন লোকেদের আশপাশ থেকে দূরে থাকে। নীল ভেজানো দরজায় টোকা দিতেই নিশুতি বেরিয়ে এলো। কাঁচুমাঁচু মুখে বলল,—স্যার, কিছু মনে করবেন না। আমি কোন অন্যায় করিনি। কারো সাতেপাঁচেও থাকি না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি প্রত্যেকবারই পুলিস এসে আমাকেই আগে ধ্যাতাবে। কী যে গেরো চলছে। বলুন স্যার, আপনারা কি জিগ্যেস করবেন?

—দু'একটা কথা।

—শেষপর্যন্ত দু একটা কথায় থেমে যায় না স্যার। বলুন স্যার।

—তুমি পুলিসের কাছে মিথ্যে বললে কেন?

—মিথ্যে? আমি? পুলিসের কাছে? উরি বাবা! না স্যার কোন মিথ্যে বলিনি।

—বলেছো নিশুতি। বলেছো। এবার যা যা জিগ্যেস করব তার সত্যিটাই বলবে। নইলে নিজেই ফাঁসবে।

—আমার মনে পড়ছে না আমি কি মিথ্যে বলেছি।

—মনে করিয়ে দিচ্ছি। যেদিন ক্ষণপ্রভা দেবী খুন হন, সেদিন তো ওরা সারাদিনই বাড়ি ছিলেন। তাই না?

BanglaBook.org

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—একেবারের জন্যেও বেরোননি, মানে আগে এই কথাই বলেছিলে।

—এখনও তাই বলব স্যার।

—না, বলবে না। কারণ, কথাটা বেমালুম মিথ্যে, নীলের গলা চড়ছে।

—মিথ্যে?

—এবার আমি তোমাকে সত্যি কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি। এখানকার ওসি সাহেবকে তুমি বলেছিলে সন্ধ্যে ছটা নাগাদ রজতশীর্ষবাবু তোমাকে সিগারেট কেনার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবং সেই সময় ওরা দুজনেই বাড়ির জামাকাপড় পরেই ছিলেন।

—হ্যাঁ স্যার।

—তুমি বুঝতে পারছ না তোমার এই মিথ্যে বলার পরিণামটা কি? সেদিন সন্ধে ছটার সময় মিসেস নন্দীকে হাউসকোট পরা অবস্থায় দেখেছিলে? নিজের চোখে?

—না, মানে রজতস্যার ছিলেন, তাই ধরে নিয়েছিলুম—

—ধরে নিয়েছিলে, তার মানে মিসেস নন্দীকে তুমি দেখোনি। কি হোল? চুপ করে আছ কেন?

আমতা আমতা করে নিশুতি বলল,—তা হবে, ঠিক খেয়াল করতে পারছি না।

—দেখ তো, এটা খেয়াল করতে পার কিনা, সেদিন দুপুর বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে রজতবাবু ওনার এক বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে যান।

—তা হোতে পারে। আমার তখন সিনেমা যাবার জন্যে মন উড়ুউড়ু করছিল।

—তার মানে তুমি রজতবাবুকে বেরতে দেখোনি?

—না স্যার।

—না। এটাও মিথ্যে কথা। সেদিন দুপুর বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে রজতবাবু এক ভদ্রলোককে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। এবং বেরবার সময় তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়।

—আমার সঙ্গে? কই না তো?

—দেখাটা তুমিই করেছিলে। কারণ সিনেমা দেখার জন্যে তোমার সেদিন অনেকগুলো টাকার দরকার ছিল। আর তুমি খুব ভালো করেই জানতে

রজতবাবুর কাছে হাত পাতলে কিছু না কিছু পাবেই। কতটাকা রজতবাবু সেদিন তোমায় দিয়েছিলেন?

—এ কথা স্যার আপনাকে কে বলেছে?

—বড় কথা সেটা নয়। কথাটা হোল তুমি টাকা পেয়েছিলে?

নিশুতির মাথাটা ততক্ষণে হেটমুণ্ডু হোয়ে গেছে।

—এ বাড়িতে একজন বেকার বুড়ো আছে। রিটায়ার্ড ম্যান। নাম হৃদয়হরণ বাঁড়ুজ্যে। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, কে কোথায় কি গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, সেগুলো ওঁর নজর এড়ায় না। তা তোমার টাকা নেবার দৃশ্যটা কী বলে দিতে হবে কে দেখেছেন।

—রজতস্যার আমাকে বলতে বারণ করেছিলেন। তাই বলিনি। উনি তো খুব মদটদ খেতেন। তাই একটা রয়্যাল স্ট্যাগ আনিয়ে রাখতে বলেছিলেন। সেই জন্যেই।

—একটা মিথ্যে ঢাকতে কয়েক লক্ষ মিথ্যেকে ডেকে আনতে হয় এটা বোধহয় বুঝতে পারছ?

—না স্যার বিশ্বাস করুন।

—কে ছিলেন রজতশীর্ষবাবুর সঙ্গে? তাকে তুমি চেনো?

—চেনা বলতে তেমন করে নয়। মাঝে মাঝেই আসতেন। মুখটা চেনা হয়ে গিয়েছিল। তবে আমাদের সঙ্গে তেমন কোন কথা বলতেন না।

—সেই বাবুটির নামটা যেন কি? জানো?

—আজ্ঞে ওরা বিশ্ববাবু বলে ডাকতেন।

—রজতবাবু বাড়ি না থাকলেও উনি আসতেন। এবং দুপুরের দিকে। তাই না?

—হ্যাঁ স্যার।

—কিসে আসতেন?

—আজ্ঞে হেঁটেই আসতেন।

—বেশ, এবার একটা ভাইট্যাল প্রশ্নের উত্তর দাও। লুকোবার চেষ্টা করো না। কারণ সবটাই আমার জানা হয়ে গেছে।

—মিথ্যে আর বলব না স্যার। বলুন তাহলে।

—ওরা দুজনে বেরিয়ে যাবার পর, তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আরও একজন এসেছিল। তুমি তাকে চেনো। সে কে?

boiRboi.net

—কি করে বলব? আমি তো সিনেমা দেখছি। পাশের বাড়ির বঙ্কার সঙ্গে।

—কিন্তু তুমি জানো, লোকটা কে?

—না স্যার বিশ্বাস করুন, এটা আমি জানি না। তবে এ ব্যাপারে আপনাকে দুজন হদিশ দিতে পারবেন। এক ওই গেজেট দাদু, হৃদয়হরণ বাঁড়ুজ্যে, আর ওই পাঁচ নম্বরের ঊর্মিলা মাসিমা। ওনারও স্যার পরের ঘরের চাটনি খেতে খুব ভালো লাগে।

—হুঁ। সেটা খোঁজ নিলেই জানতে পারব। আর একটা কথা, রজতবাবু সন্ধে ছটা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসার পর তুমি কি করছিলে?

—আজ্ঞে ওনার মালের বোতল, আর সিগারেট পৌঁছে দিই।

—তখন উনি সাদা শার্ট আর অ্যাশকালার প্যান্ট পরেছিলেন।

—হবে হয়তো। ঠিক মনে পড়ছে না।

—অথচ তোমার নিখুঁতভাবে মনে ছিল উনি লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পড়েছিলেন। এবং সে সময় তুমি ক্ষণপ্রভা দেবীকে চোখেও দেখনি কিন্তু বলেছিলে উনি হাউসকোট পড়েছিলেন?

নিশুতি আবার নিরব।

—আরও একটা কথা তুমি বানিয়ে বলেছ। সেদিন গভীর রাতে কেউ একজন দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

—হ্যাঁ স্যার। তন্দ্রার ঘোরে সেই রকমই মনে হয়েছিল।

—তন্দ্রার ঘোরে অনেক সত্যিকে মিথ্যে দিয়ে সাজানো যায়। আসল কথা সে রাত্রে তুমি কোন শব্দও পাওনি। কেউই যাতায়াত করেনি। রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যে তুমি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছিলে। মনে করতে পার?

—অদ্ভুত মানে?

—রজতবাবু মত্ত অবস্থায় একজনের কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে যাচ্ছেন। লোকটাকে তুমি চেনো। কে সে?

—না, স্যার, নিশুতি প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই দেখিনি। সেদিন দুপুরে ঘুম হয়নি, তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিলুম।

—তাই? আচ্ছা বল তো ঘুষ বড়ো না ঘুম বড়ো?

—আজ্ঞে ঠিক বুঝলাম না।

—সময় এলেই বুঝবে। আর শোন জগদ্দল ছেড়ে পালাবার চেষ্টা কোর না। তোমার পেছনে ফেউ আছে।

নিশুতিকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নীল আর দীপু সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল।

নন্দীদের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ছিল। টোকা দেবার আগে দীপু জিগ্যেস করল,—গুরু তুমি নিশুতির ব্যাপারে এতো কিছু জানলে কি করে?

—ব্যাপারটা কি জানিস, যে রাস্তায় আমার ভাবনা এগোচ্ছে, সেখানে নিশুতির প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলে খুনি এগোতে পারতো না। তাই, খানিকটা হৃদয়হরণবাবু, খানিকটা ঊর্মিলা দেবী আর খানিকটা নিজের টোপ ফেলার চাল। পাশের বাড়ির বঙ্কার সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। আরও একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তবে নিশুতি ভেঙে পড়ল বলে।

দরজায় টোকা দিতে হোল না। একটু চাপ দিতেই খুলে গেল। দেখা গেল জগৎপ্রিয় একটা ছবির সামনে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষণপ্রভার লাস্যময়ী ক্লোজআপ ছবি।

—কি মশাই, সুন্দরী মেয়ের ছবি দেখেই জমে গেলেন?

—সৌন্দর্য তো দেখার জন্যেই। আর এই বয়েসে এক সুন্দরী যুবতীর ছবি দেখাটা অপরাধ নয়। তাছাড়া মহিলা খুব ভালো অভিনয় করতেন। আমি দেখেছি। বিয়েটিয়ে করে জড়িয়ে না গেলে খুব নাম করতেন। তাই ভাবি আমাদের জীবন ক্ষণপ্রভার মতোই ক্ষণস্থায়ী।

নীল ওকে থামাল,—ঘর থেকে নতুন কিছু পেলেন?

—একটাই। উপলব্ধি। এমন সুন্দর আর দামি আসবাবে সাজানো ঘরের মালিক আর মালকিন কেউই আর বাস করার জন্যে ফিরে আসবেন না।

—শ্মশানবৈরাগ্য? ভাল। তা টাকাকড়ি বা মূল্যবান জিনিস যা পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো কি পুলিস সিজ করেছে? সম্ভবত আপনাদের সিজার লিস্ট এখনও বানানো হয়নি।

—ওটা আমাদের সাহেব বলতে পারবেন। আসলে উনি একটা পলিটিক্যাল ঝামেলায় আটকে আছেন। কোর্ট অর্ডার না নিয়ে তো।

—তাড়াতাড়ি করুন। অনেক টাকা। এভাবে তো ফেলে রাখা যায় না।

—আমি স্যার হুকুমের দাস। ওটা বড় সাহেবই করে নেবেন। তবে মোটামুটি একটা লিস্ট সাহেবের কাছে পাঠানো হয়ে গেছে। বড়বাবু থাকতে আমার কিছু করার এক্তিয়ার নেই।

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু জগৎপ্রিয়বাবু, এই কদিনের মধ্যে আপনাদেরই কেউ একজন বা তৃতীয় কোন ব্যক্তি যে এই ঘরে এসেছিলেন।

বিস্মৃত দৃষ্টি মেলে জগৎপ্রিয় বলে,—আপনি জানলেন কিভাবে? কেউ বলেছে?

—না, আমার অনুমান। এবং সেটা অমূলক নয়। আলমারির পাল্লাটা ইঞ্চিখানেকের মতো ফাঁক হয়ে আছে। অথচ আমরা সেদিন ভালো ভাবেই বন্ধ করে গিয়েছিলাম।

—ওহ্ মাই গড, বলে জগৎপ্রিয় আলমারির কাছে ছুটে গেল। একটানে পাল্লাটা খুলে ফেলল। তারপরই মাথায় হাত দিয়ে সেখানেই বসে পড়ল।

—আর কিছু নেই তো, তাই না?

—নিজেই দেখুন।

পকেট থেকে পাতলা নাইলন গ্লাভসটা বার করে পড়তে পড়তে নীল আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গুপ্ত লকারের পাটা হাতখানেক মতো সরে আছে। একটু ঠেলা দিতেই পুরো পাটাটা সরে গেল। লকার ফাঁকা। কিচ্ছু নেই সেখানে। পড়ে ছিল একটা চিরকুট। তাতে লেখা, হাতে লেখা নয়। ডিটিপি কম্পোজ, পাপের টাকা থাকে না। নিয়ে গেলাম। আমার কাজে লাগবে।

মৃদু হেসে নীল বলল,—মিনিমাম লাখ দশেক টাকা কারেন্সি নোট ছিল। তাই না?

—হ্যাঁ, সেদিন তাই মনে হয়েছিল।

—অথচ চাবি থাকে আপনাদের কাছে। ফ্ল্যাটের দরজায় তালা। পুলিসের নিজস্ব তালা।

—তালার কথা আর বলবেন না। এখনকার তালা খুলিয়েরা যে কোন তালাই নিমেষে খুলে দিতে পারে।

—তার মানে আপনি বলছেন আপনাদের চোখে ধূলো দিয়ে কোন একজন সবকিছু নিয়ে চম্পট দিয়েছে?

—তাই তো মনে হচ্ছে। আচ্ছা এর মধ্যে নিশুতির হাত নেই তো?

—আপনি বলছেন বাইরের তালাঅলা ডেকে নিশুতি দরজা খুলে টাকাকড়ি নিয়ে গেছে? এতোটা সাহস কী হবে?

—সাহস না থাকলে কী চোর হওয়া যায়?

—তা বটে।

—আচ্ছা স্যার, আর কিছু কি খোয়া গেছে? দেখলে হোত না?

—আমার ধারণায় আরও একটা জিনিস খোয়া যেতে পারে।

—কী সেটা?

—যে মহিলার হুদো হুদো প্রেমিক বা বয়ফ্রেণ্ড বা গুণমুগ্ধ থাকে তার কাছে কী কিছু লাভ লেটার থাকবে না? থাকবেই। খুঁজে দেখুন তো কোন প্রেমপত্রের বাণ্ডিল-টাণ্ডিল আছে কিনা? অবশ্য সেটা খুব নিভৃত স্থানেই থাকবে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কিছু পাওয়া গেল না। তবে যেটা পাওয়া গেল সেটা জগৎপ্রিয়র অন্যমনস্কতার সুযোগে দীপু পকেটে গুঁজে ফেলেছে। জিনিসটা চোখের সামনেই ছিল। অথচ এর আগের দিন ছিল না। নীল দীপুকে ঘাঁটালো না। পরে দেখে নিলেই চলবে। যা দেখবার দেখা হোয়ে গিয়েছিল। নীল বলল,—চলুন মিস্টার কর। এবার ফেরা যাক। আমাদের আবার অনেকটা যেতে হবে।

—আর কিছু খোঁজাখুঁজি করবেন না?

—যা পাবার তা পেয়ে গেছি। আর যা পাইনি মনে হচ্ছে তাও পেয়ে যাব।

উৎসাহিত মুখে জগৎপ্রিয় সরাসরি জিগ্যেস করে,—কী? কী সেটা?

—কিছু একটা। যেটা খুনির বিপক্ষে মারাত্মক প্রমাণ।

—আমাকে বলা যায় না?

—যাবে। কিছুদিন পরে।

—আই সি। তাহলে আমরা কি এবার এগোতে পারি?

—হ্যাঁ চলুন।

এগোতে গিয়ে হঠাৎ নীল দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘাস সবুজ, বাফ আর সাদা রঙের চকরাবকরা দামি কার্পেটের ওপর জিনিসটা চকচক করছিল। সোফার নীচে। নীল হেঁট হয়ে সেটা তুলে আনল। একটা ছোট্ট ক্যামেরা। খুবই ছোট। মুঠোয় ভরা যায়। জাপানি ওলিম্পাসের মিনি হট্‌শট্। নাম্বার প্লেটে দেখল প্রায় আটাশটা ছবি তোলা হয়েছে।

—ক্যামেরাটা আমি কি কদিনের জন্যে রাখতে পারি মিস্টার কর?

—আমি তো পারামিশন দিতে পারি না। আপনি বরং—

—সত্যশোভনবাবুর কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে এইতো?

—আমায় অযথা দোষারোপ করবেন না।

—করিনি। কিন্তু এর ভেতরের আটাশটা ছবি ডেভেলপ করা একান্তই দরকার।

—ঠিক আছে, এক কাজ করুন না, ওটা নিয়ে থানায় চলুন। তারপর একটা লিখিত স্টেটমেণ্ট দিয়ে—

—ওক্কে, তাই হবে। লেটস্ মুভ অন।

BanglaBook.org

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীল চমকে উঠল,—সর্বনাশ রাত এগারোটা। হ্যাঁ মশাই বাড়ি ফিরব কি করে?

—এখানে তো আপনার পরিচিত একজন আছেন।

—কিন্তু এতো রাতে?

—সে তো আপনার ফ্যান। না হলে আমার কোয়ার্টার আছে। একবারে রাস্তায় পড়বেন না। তবে ব্যাচেলার্স ডেন।

নীল কিছু না বলে দীপুকে বলল,—দীপু এরপর গেলে শ্যামচাঁদ নির্ঘাত রেগে যাবে। তুই চট্ করে ওদের বাড়ি চলে যা। আমি থানা ঘুরে আসছি।

১৭

স্বপ্নার কোন বিরক্তি নেই। কিছু না পেয়ে অত রাতে দুজনের জন্যে ফ্যানেভাতে চাপিয়ে দিল। শ্যামচাঁদের যদিও অভ্যেস সকাল সকাল শুয়ে পড়া। কিন্তু নীল ব্যানার্জি যাওয়াতে ওর ঘুম মাথায় চড়ে গেল। বিছানায় বসে বসেই শ্যামচাঁদ বলল,—আমায় একটা খবর দেবেন তো দাদা। আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারতাম।

—না হে শ্যামচাঁদ, যদিও তুমি আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছ, তবুও ইনভেস্টিগেশনের কাজে তোমাকে সঙ্গে রাখা যায় না।

—তা তো বটেই। তা কদ্দূর এগোলেন? মানে মিস্ট্রির জট খোলার কাছাকাছি নিশ্চয় পৌঁছে গেছেন।

—তোর কি মনে হয় শ্যাম, দীপু গরম ভাতে ঘি আর কাঁচালঙ্কা মাখতে মাখতে বলল, ইনভেস্টিগেশন ব্যাপারটা খুব সোজা?

—না, একবারও বলিনি। জানতে চাইছিলাম দাদা কদ্দূর এগোলেন।

—না গো শ্যামচাঁদ সেভাবে আর কোথায় এগোনো হচ্ছে। তবে, ও হ্যাঁ, দীপু, খাটের নীচ থেকে তুই যেন কি একটা কুড়োলি?

বাঁ হাত দিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে বার করে আনল একটা মুক্তো।

সোনালি রঙের গোল মুক্তো। ছ-সাত রতির মতো সাইজ। জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে নীল বলল,—ইদানীং দেখছি অধিকাংশ লোকের হাতে, সে বাচ্চা থেকে বুড়ো, যেই হোক না কেন, ডান হাতের তর্জনী আলোকিত করে থাকে একটি মুক্তো। মেয়েদের হোলে বাঁ হাতে। কী যে হয় এতে কে জানে? আরে তাইতো, স্বপ্না, তোমার আঙুলেও তো একটা মুক্তো। মুক্তো পরলে কি হয়?

—আমায় তো জ্যোতিষী বললেন, মনে শান্তি আসে। অশান্ত মনের উল্টোপাল্টা চিন্তা কমায়।

—কমেছে?

—ঠিক বুঝতে পারি না। কারণ শ্যামের সঙ্গে আমার রোজই ঝগড়া হয়।

আর থাকতে না পেরে শ্যাম বলল,—আবার সেটা মিটেও যায়। ঐ মুক্তোর এফেক্ট আর কি? তা এটা আপনারা পেলেন কোথায়?

—একটি সুদৃশ্য কক্ষে। যেখানে তোমাদের ক্ষণপ্রভা দেবী খুন হয়েছিলেন।

—তা থাকতে পারে। ভদ্রমহিলার সর্বাঙ্গে গয়নার ছড়াছড়ি। হাতেও অনেক গ্রহ ধরা থাকতো।

—তুমি দেখেছ?

—না দেখলেও বলা যায়। নইলে অতো বড়লোক হয় কি করে?

কথার কথা। এ কথার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু নীল ভাবছিল, পুলিস এর আগে ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। এমনকি পুলিস ক্যামেরাম্যান নানান অ্যাঙ্গেলে অনেক ছবিও নিয়েছে। তাহলে বিশেষ দুটো জিনিস, এক নম্বর মুক্তো, দু নম্বর মিনি হট্‌শট্। কারো চোখে পড়ল না কেন?

ডিম সেদ্ধ ভাঙতে ভাঙতে দীপু বলল,—তুমি কি ভাবছ আমি বলতে পারি। কেন পুলিসের চোখে পড়ল না। মুক্তো ছেড়ে দিলাম, কিন্তু ক্যামেরা? তাইতো?

—ইয়েস। তার মানে কি পুলিস দায়সারা খুঁজেছে?

—আচ্ছা দাদা, স্বপ্না প্রশ্ন করল, পুলিস কিন্তু ঘটনার পরেও কয়েকবার যাতায়াত করেছে।

—হ্যাঁ, সেই রকমই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তা এ দিয়ে তুমি কি বোঝাচ্ছ?

—এক পুলিস দায়সারা খুঁজেছে। নয়তো দেখেও দেখেনি। মানে, প্রয়োজনীয় নয় বলে নেগলেক্ট করেছে। আর মুক্তোটা হয়তো চোখেই পড়েনি।

—মুক্তোর ব্যাপারটার সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। ছোট্ট জিনিস, চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই বলে ক্যামেরা?

—তারা মনে করেছে ওটা কোন টয় ক্যামেরা।

—কিন্তু ওদের বাড়িতে কোন বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে নেই।

—তাহলে?

—হ্যাঁ, এই তাহলেটাই বার করার দরকার। প্রথমত জানতে হবে ক্যামেরার মধ্যে ছবিগুলোয় কি আছে? আর দ্বিতীয় কথা মুক্তোটা কোন আংটি থেকে ছিট্‌কে গেছে। কার আংটি? সেটা বোঝার কোন উপায় নেই। ছেলেও হোতে

BanglaBook.org

পারে, মেয়েও হতে পারে। যে ছেলে এবং মেয়ের হবার সম্ভাবনা বেশি তারা আজ আর নেই। তাছাড়া ক্ষণপ্রভার আঙুলে তো মুক্তোর আংটি ছিলই।

—কিন্তু, দীপু প্রশ্ন করে, পুলিস ঘর সিল করে দেবার পর লকার ফাঁকা হোয়ে যায় কি ভাবে? বাড়ির লোকের কারো সাহস বা সাধ্য হবে না পুলিসের তালা ভেঙে ঘরে ঢোকার। সেটা জানাজানি হবেই। আর নিশুতি? সে বড়জোর চোরকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু একা? অসম্ভব।

—লকার ফাঁকা মানে, স্বপ্না জিগ্যেস করে।

—হ্যাঁ, ফাঁকা। টাকাকড়ি, গয়না, সব হাওয়া।

—সে কী? পুলিস তো ঘর সীল করে দিয়েছিল।

—তবুও গেছে।

শ্যামচাঁদ হঠাৎ একটা বোকা বোকা প্রশ্ন করল,—আচ্ছা পুলিস নিজে হাপিস করে দেয়নি তো! ওদের গুণে কোন ঘাট নেই। আমার যদ্দুর মনে হয়, প্রথমদিন পুলিস গিয়ে দেখে ঘরে পর্যাপ্ত অর্থ আছে, সেদিন তারা হাতাবার সুযোগ পায়নি। তাছাড়া প্রচণ্ড দুর্গন্ধও ছাড়ছিল। থাকতে পারেনি। পরে তদন্তের নামে তারা লকারের মাল সাফ করে। আর সেই সময়েই একটা মুক্তো হয়তো ছিট্‌কে গেছে। দাদা, কিছু মনে করবেন না। পুলিস হচ্ছে শকুনির জাত। চান্স পেলেই ওরা ঝেড়ে দেবে। শুধু পুলিস কেন, আপনি হাসপাতালে যান। হয়তো রাস্তায় কোন অ্যাকসিডেণ্ট হোল, কে আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর থেকে সোনাদানা বার করে নেবে। সে তো হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল। পরের দিন গিয়ে কিন্তু আপনি আর কোন গয়নাই তার গায়ে দেখতে পাবেন না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

—পুলিসের ওপর তোমার খুব রাগ, তাই না শ্যামচাঁদ?

—আমার রাগে কার কি এসে যায়? তবে এটাই সত্যি কথা। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমাদের সমাজে চার শ্রেণীর জীবিকাধারী মানুষ আছে যাদের রক্তচোষা ভ্যামপায়ারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পুলিস, উকিল, ডাক্তার আর বর্তমানের স্কুলমাস্টার। গরীব নিধনের জন্যে, বা ভালো মানুষকে ফতুর করার তালে এরা ওৎ পেতে বসে থাকে। আর স্কুলমাস্টার? ক্লাসে পড়াবে না। বলবে আমার কোচিং-এ এসো যদি পাশ করতে চাও।

—সবাই কি তাই?

—কাগজগুলো খুলে মন দিয়ে পড়ুন। আর সবার ওপর আছে রাজনৈতিক দাদা আর মন্ত্রীরা। তারা মনে করে দেশটা তাদের বাপের সম্পত্তি।

—শ্যামচাঁদ, তুমি আজ শুয়ে পড়। কাল ভোরে তোমার ডিউটি।

—হ্যাঁ দাদা, স্বপ্না বলে, ওকে একটু বোঝান তো। মাঝেমাঝে ওর কথাবার্তা শুনলে আমার ভয় লাগে। কে কোথায় শুনবে, রিভেঞ্জ নিতে যা খুশি করে দিতে পারে।

কথা আর সে রাতে বেশিদূর এগুলো না। দীপুও একসময় শুয়ে পড়ল। কেবল নীল চলে গেল গৃহসংলগ্ন দাওয়ায়। বাইরে তখন ঘোর অন্ধকার। সিগারেট ধরিয়ে ও ঠায় বসে রইল অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে।

১৮

নিজের বাড়িতে ঝুলবারান্দায় বসে ছবিগুলো নাড়াচাড়া করছিল নীল। আটাশটা ছবির বাইশটাই মামুলি। স্টেজের ছবি। ক্ষণপ্রভার নাচের ছবি। কিছু আছে সমুদ্রতীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু বাকি ছটা বেশ ইন্টারেস্টিং। যদিও পাকা হাতের ছবি নয়। যে ছবি তুলেছে ছবির সামনের দিকে তার স্যাডো এসে গেছে। ছবিতে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির সঙ্গে ক্ষণপ্রভাকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। সেটা ঘরের মধ্যে তোলা। আর একটায় ক্ষণপ্রভার হাস্যরত ক্লোজাপ। একটায় রজতশীর্ষ লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরা। হাতে সিগারেট। অন্য তিনটে সেই অজানা লোকটির। নানা ভাবে তোলা। প্রোফাইল আছে। ফ্রন্টফেস আছে। একটা হাসি মুখের। অন্যটা একটু গম্ভীর গম্ভীর। কিন্তু লোকটা কে? স্টেট ব্যাঙ্কের ভৈরব বি. ঘোষের একটা ডেসক্রিপশন দিয়েছিল। তার সঙ্গে কিছুটা মিলছে। ছবির লোকটির গায়ের রঙটা ফর্সাই। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমাও আছে। কিন্তু বিশ্বদীপ ঘোষ পরিচয় দিয়ে পরে যে লোকটি স্টেটব্যাঙ্কে রজতের খোঁজে গিয়েছিল তার সঙ্গে এই ফটোর কোন সামঞ্জস্য নেই। অবশ্য একটা ফটো যখন হাতে এসেছে তখন লোকটাকে খুঁজে বার করার একটা রাস্তা পাওয়া গেল। কিন্তু মুক্তোর ব্যাপারটা কী? ব্যবহৃত মুক্তো। তলার দিকে ময়লার একটা আস্তরণ পড়েছে। কোনভাবে ধস্তাধস্তিতে মূল আংটি থেকে মুক্তোটা ছিটকে গেছে। কিন্তু কার হাতের মুক্তো? ক্ষণপ্রভার নয়। তার আঙুলে মুক্তোর আংটি ছিল। রজতশীর্ষ? নাকি ছবির লোকটার? একজনকে আর পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি, মানে ছবির লোকটিকে যেমন করেই হোক খুঁজে পাওয়া দরকার।

যদিও ডাক্তার সিগারেট খেতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু একা বসে ভাবনার সাগরে ডুব দিলে নীল নিজেকে সামলাতে পারে না। একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে আপাত জটপাকানো ঘটনাগুলো আবার সাজাতে শুরু করল। ঘটনার দিন দুপুরে রজতশীর্ষ এবং আরও একজন ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়েছিল। ক্ষণপ্রভা খুন

হয়েছে তিনটে থেকে ছটার মধ্যে। যদি ওই দুজনের কেউ খুনি হয় তাহলে তাদের ফিরে আসতে হবে ছটার আগে। আর যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি হয় তাকেও আসতে হবে ছটার আগে। এবং সে পরিচিত লোক। অপরিচিত হোলে তার পক্ষে ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। ধরা যাক তৃতীয় ব্যক্তিটি খুন করেছে। এবং খুন করে চলে গেছে। এখন প্রশ্ন রজত কী বাড়ি ফিরেছিল? হৃদয়হরণবাবু বলছেন ফিরেছিল নিশুতি বলছে ফিরেছিল। যদি ফিরে থাকে তাহলে সে কেন তার স্ত্রীকে মৃত দেখে পুলিসে রিপোর্ট করল না? তার মানে কী সে নিজেই তার স্ত্রীকে খুন করেছে? এবং খুন করে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করে আটটা নাগাদ ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ট্রেনের তলায় গলা বাড়িয়ে দিয়েছে? তবে একটা ব্যাপার বেশ বোঝা যাচ্ছে ক্ষণপ্রভাকে যেই খুন করে থাকুক না কেন, সে বেশ স্বাস্থ্যবান এবং বলবান পুরুষ। নাহলে ক্ষণপ্রভার মতো যুবতী এবং স্বাস্থ্যবতী মহিলাকে নাইলন দড়ির ফাঁসে চট্ করে কাবু করা বেশ শক্ত। আরও একটা কথা, সে রাত্রে রজত কী একা বেরিয়েছিল? না সঙ্গে কেউ ছিল?

—কি গুরু খুব গভীর চিন্তায় ডুবে আছ? অ্যাসট্রেটা দেখেছ? উপছে পড়ছে। ডাক্তার কি বলেছে খেয়াল আছে?

আনমনে নীল দীপুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—ক্ষণপ্রভাকে মার্ডার করার কি মোটিভ হোতে পারে? ভেবেছিস কিছু? মোটিভটা না ধরা গেলে তো ক্রাইমের কাছাকাছি পৌঁছনই যাচ্ছে না।

সামনের চেয়ারে বসতে বসতে দীপু বলল,—খুবই জটিল প্রশ্ন। টাকার ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সোনাদানা আর নগদ মিলিয়ে লাখ লাখ টাকা।

—টাকাই যদি হবে, তাহলে রজত খুনি নয়। আর রজত খুনি না হোলে তার আত্মহত্যার একটা বেসিক মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু—

—হ্যাঁ নীলদা, ওই কিন্তু, খুনি যদি টাকার জন্যেই খুন করে থাকে তাহলে সে কেন সেদিনই টাকা বা গয়নাগাঁটি নিয়ে গেল না? কেন অন্য দিনের অপেক্ষায় থাকবে?

—আর যদি টাকা মোটিভ না হয়?

—তাহলে কী অবৈধ প্রণয়? অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপার হোলে রজত খুন করতে পারে। কারণ স্ত্রীর প্রেমিককে তার পক্ষে হয়তো সহ্য করা সম্ভব হয়নি। ব্যভিচারিণীকে কোন পুরুষই বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না।

—নাহ্ রে দীপু, ব্যাপারটা খুবই জট পাকানো। এখানে তৃতীয় কারো উপস্থিতি আমি টের পাচ্ছি। দুজনের মৃত্যুর পরও ওই ঘরে পুলিসের লাগানো তালা খুলে টাকাকড়ি সব চুরি হয়। এবং পাওয়া যায় একটি চিরকুট। যেখানে সে স্বীকার করেছে সেই পাপের সম্পদ নিয়ে গেছে।

বলতে বলতেই হঠাৎ নীল লাফিয়ে ওঠে,—ওহ্ মাই গড। এদিকটা তো তেমন ভাবে ভাবিনি।

—কোন দিক?

—শ্যামচাঁদের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পুলিসের লক ভাঙা একমাত্র সম্ভব পুলিসের পক্ষেই। এবং পুলিসেরই কেউ পরে ওই ঘরে এসেছে এবং টাকাকড়ি যা পেয়েছে সব নিয়ে গেছে।

—বেশ তা না হয় হোল, কিন্তু খুনটা করল কে? রজত আত্মহত্যা করল কেন? নাহ্ নীলদা সত্যি বলতে কি এবার তুমি খুব বেকায়দায় পড়ে গেছো। তোমার সামনে ক্লু বলতে কটা ছবি, একটা মুক্তো আর একরাশ ধোঁয়াশা। আজ পর্যন্ত বিশ্বদীপেরও কোন ট্রেস পেলে না। ওদিকে রেলপুলিসও রজতশীর্ষর কেসটা আত্মহত্যা বলে ফাইল ক্লোজ করে দিয়েছে। আর তোমার ডাঙার পুলিস, সমাজবিরোধী শায়েস্তা করতে কে না কে ক্ষণপ্রভা নন্দীর মার্ডার কেস এস. আই জগৎপ্রিয়র কাঁধে চাপিয়ে চোখ কান বন্ধ করে দিয়েছে। আমি বলি কি, নীলদা, তোমার বয়েস বাড়ছে, আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার দরকার নেই। সত্যি কথা বলতে কি এতে তোমার কোন অর্থকরী লাভ নেই। আর যশ, সে তুমি অনেক পেয়েছ। এবারের মতো ক্ষ্যামা দাও, তার চেয়ে, নন্দিনীদিকে বিয়ে করে কিছুদিনের জন্যে কোথাও ঘুরে এসো, হনিমুন করতে।

—তুই থামবি, একবার ভ্যানভ্যান করা শুরু করলে আর থামতে চাস না। তোর কী তোর নীলদার ওপর থেকে সব বিশ্বাস হারিয়ে গেছে? তোর কী মনে হচ্ছে আমি ফুরিয়ে গেছি? হারিয়ে গেছি? ওরে পাগল, তাহলে শুনে রাখ ক্ষণপ্রভাকে কে খুন করেছে সেটা আমি প্রায় আঁচ করে ফেলেছি।

—তার মানে, তুমি?

—হ্যাঁ। আর এটাও বুঝতে পারছি খুনটা কেন করা হয়েছে, এটাও সেই হিসেব বলছে নন্দীদের সব টাকা আর গয়না কে নিয়েছে। কেবল এটাই বুঝতে পারছি না রজতশীর্ষ কী সত্যিই সুইসাইড করতে গিয়েছিল? নাকি কেউ তাকে হত্যা করতে নিয়ে গিয়েছিল?

—তাহলে তুমি ডিরেক্ট অ্যাকশনে নামছ না কেন?

—সময়। আমি বিশ্বাস করি ঠিক সময়টি না এলে ঠিক কাজটি হয় না।

—সে সময়টা কবে আসবে?

—আসবে। খুব শীগগির আসবে। স্বপ্নার ওপর একটা ব্যাপার নির্ভর করে আছে। ব্রিজটা সত্যি কিনা সেটার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

—সবটাই হেঁয়ালি করে রাখবে আমার কাছে, এইতো?

—না, ঠিক তা নয়। অঙ্কটা একটা জায়গায় এসে আটকে যাচ্ছে তো তাই। আগে দুই থেকে দুই বাদ দিলে শূন্যে আসুক, তারপর সব বলব।

—কিন্তু আমি তোমার সহকারী, এটা ভুলে যেও না।

—ভুলিনি রে। তবে আমায় আর একটু সময় দে। হ্যাঁ, কাল আমরা জগদ্দল যাচ্ছি। রেডি হয়ে নিস। ভোরেই বেরবো।

—আমার একটা কথা হঠাৎ মনে হোল, বলব?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কেন বলবি না? বল।

—ক্ষণপ্রভা নন্দীর আলমারির লকার থেকে যে চিরকুটটা আমরা পেয়েছিলাম, সেটা হাতের লেখায় নয়। ডিটিপি কম্পোজ করা।

—হ্যাঁ, তাতে কি?

—বীরুভাই শ্রীবাস্তবের বাড়িতে কিন্তু আমরা ডিটিপি মেশিন দেখেছি। আর একমাত্র সেই লিখতে পারে পাপের টাকা নিয়ে গেলাম।

নীল দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল,—পশ্চিমবঙ্গে কি একটাই ডিটিপি মেশিন আছে? বীরুভাইয়ের রাগ রজতের ওপর। নট ক্ষণপ্রভা। আর তার পক্ষে কী সম্ভব কলকাতা থেকে জগদ্দলে গিয়ে পুলিসের লাগানো সিল ভেঙে লকার থেকে টাকা সরানো? মাথা থেকে আজগুবি চিন্তা ছেড়ে যা বললাম তাই করিস। কাল ভোরেই বেরচ্ছি।

১৯

শ্যামচাঁদ ভোরেই বেরিয়ে গেছে। দীপুকে স্বপ্নাদের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে নীল চলে গেল কী একটা বিশেষ কাজ আছে বলে। দীপু তবু একবার জিগ্যেস করেছিল, —আমি কি তোমার সঙ্গে যাব?

উত্তরে নীল বলে গিয়েছিল,—অনেকগুলো জায়গায় ঘোরাঘুরি আছে। আর তোকে নিলেও চলবে না। তুই বরং স্বপ্নাকে জিগ্যেস করে রাখিস যে ব্যাপারে ওর খোঁজ নেবার কথা ছিল সেটা নিয়েছে কিনা।

—কতক্ষণের মধ্যে ফিরবে?

—যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। স্বপ্নাকে বলিস বেশি কিছু রান্নাবান্না যেন না করে। ওদের ওপর খুব অত্যাচার করা হয়ে যাচ্ছে। বলেই নীল হাওয়া।

অগত্যা দীপু গিয়ে জুড়ে গেল স্বপ্নার সঙ্গে। মুড়ি আর তার সঙ্গে রসটুসটুস এবং মুচমুচে জিলিপি দিয়ে মেজাজে খেতে খেতে দীপু জিগ্যেস করল,—বউঠান। নীলদা একটা কথা তোমায় জিগ্যেস করতে বলেছিল।

স্বপ্না চা করছিল। করতে করতেই বলল,—দাদার কাজ, সেকি ফেলে রাখতে পারি? দাদাকে বোল উনি যা সন্দেহ করেছিলেন দ্যাট ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।

—ব্যাপারটা কি? আমায় একটু হিন্ট্ দেওয়া যায় না?

—দোহাই ঠাকুরপো। আমাকে বিশ্বাসহন্তা হোতে বোল না। ইট ওয়াজ আ 'জেন্টেলম্যানস' এগ্রিমেন্ট। নট টু স্পীক এনিবডি।

—টপ্ সিক্রেট বলছ?

—হ্যাঁ ভাই।

—তাহলে আর কি হবে। একজন গেলেন জগদ্দল বেড়াতে। অন্যজন টপ সিক্রেট বলে মুখে কুলুপ আঁটলেন। আমার সামনে এখন দুটো কাজ। হয় ঘুমনো নয়তো জগদ্দলের তামাম বালবাচ্চাদের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে যাওয়া।

—তাই যাও। আমাদের এখানকার জায়গাটাও দেখা হয়ে যাবে। আচ্ছা, সেই বিশ্বদীপ ঘোষের কোন সন্ধান তোমরা পেলে?

—নীলদা পেয়েছে কিনা জানি না। তবে আমি পাইনি। নট ইভন্ শ্যাম। ও অবশ্য একদিন খুব ডানপিটে ছিল। এখন কেমন যেন নেতিয়ে গেছে। লেদের কারখানায় চাকরি আর বাড়ি এসে হয় টিভি নয় বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাকা। আচ্ছা বউঠান, শ্যাম তোমায় খুব ভালবাসে তাই না?

—অ্যায় পাজী কোথাকার। এখন বেরোও তো বাড়ি থেকে।

টেবিলের ওপর শ্যামচাঁদের এক বাণ্ডিল বিড়ি পড়েছিল। তার থেকে একটা তুলে নিয়ে বিড়ির পেছনে পাকা নেশারুর মতো বার কয়েক ফুঁ দিয়ে তারপর মৌজ করে সেটি ধরাল।

—ইস্, শেষকালে তুমিও বিড়িখোর হয়ে গেলে?

—আরেব্বাস, বিড়ি ইজ নট এ যাতা নেশা। যারা বিড়ি খোর তারা চট্ করে সিগারেটে কনভিন্স্ড্ হয় না। যাকগে, যেটা বলছিলাম, তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ নন্দীদের বাড়ি থেকে পুলিসের সিল থাকা সত্ত্বেও টাকাকড়ি লোপাট হয়ে গেছে?

BanglaBook.org

—শুনেছি তো।

—কে নিতে পারে? আমার মনে হয় পুলিসেরই কাজ। শ্যাম সেদিন ঠিকই বলেছিল।

—পুলিসের ওপর কেন জানি না শ্যামের খুব রাগ। ও তদন্তের কি বোঝে? সঠিক বলতে পারবেন দাদা। আমার মনে হয় উনি জেনেও গেছেন হু ইজ দ্য রিয়াল কালপ্রিট।

—আমাকেও সেদিন তাই বলল। তা তাকে ধরছে না কেন?

—দাদা লোকটিকে হাতেনাতে ধরতে চান।

—হাউ? লোকটা কি ফারদার চুরি করতে আসবে?

—আসবে। আমার মনে হয় একটি বিশেষ জিনিস সে আবার নিতে আসবে। কারণ সেখানেই তার মৃত্যুবাণ।

—কী সেটা? নাকি বলা বারণ?

—না। তেমনভাবে বারণ নয়। একগুচ্ছ প্রেমপত্র। যার মধ্যে ক্ষণপ্রভা দেবীর অতীতের অনেক ইতিহাস আছে। মানে ক্ষণপ্রভা দেবীকে দেওয়া তার স্তাবকদের কিছু প্রেমপত্র। মানে যতটুকু শুনেছি।

—সেগুলো পেয়ে লাভ?

—সেখানেই হয়তো খুনি লুকিয়ে আছে।

—খুনির মোটিভটা কি?

—বলব?

—হ্যাঁ বল না?

—উগ্র প্রেম আর প্রেমহীনতার কলঙ্কিত কাহিনী। ক্ষণপ্রভা দেবীর জীবনে অনেক স্ক্যাণ্ডাল আছে। তার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রবঞ্চনারও অনেক ইতিহাস আছে। আর সেই ইতিহাসের গহ্বর থেকে একজন উঠে এসেছে। হয়তো তারই পরিণতি ক্ষণপ্রভা হত্যা।

—প্রেমিকটি কে? বিশ্বদীপ?

—তুমি খুব চালাক। পেটের কথা ভুলিয়ে ভালিয়ে জানতে চাইছ। তবে সত্যি বলি প্রেমিকটি কে তা আমি জানি না। অবশ্য জানলেও বলা বারণ।

—আমি বোধহয় এবার খানিকটা গেইস করতে পারছি।

—বলবে, না বলবে না?

—আমি তোমার মতো ভীতু নই। আর অতো ছুপ ছুপ বাতিক আমার নেই। দ্যাট ম্যান ইজ বিশ্বদীপ ঘোষ। যার সঙ্গে ক্ষণপ্রভার ক্লোজআপ এবং অন্তরঙ্গ ছবি আছে।

স্বপ্না চুপ করে থাকে।

—কী, ঠিক বলিনি?

—ঠিক বেঠিকের কথা পরে। কিন্তু সেই বিশ্বদীপ লোকাটাই তো হাওয়া।

—লোকটা কী কর্পূর? হাওয়ায় উবে গেল? আমার মনে হয় লোকটা আউট অব পশ্চিমবঙ্গ।

—আউট অব দিস পৃথিবীও হতে পারে না কী?

—একথা বলছ কেন?

—কারণ লোকটা নিজের অজান্তেই একজনের শত্রু হয়ে গেছে। তার কাছে অনেক সূত্র আছে যা দিয়ে নিমেষে খুনিকে ধরা যায়।

—তার মানে বিশ্বদীপ খুনি নয়?

—তা কী করে বলব? তবে সে যদি খুনি না হয় তাহলে সে নিজেই খুনির শত্রু। আর এই খুনিটি এতোই সজাগ তার দ্বারা সব কিছুই করা সম্ভব।

এই সব কথার মধ্যেই মিতা দাস এসে হাজির। মাত্র কদিনেই মিতা দাসের চেহারায় একটা বিষণ্ণতার ছাপ পড়ে গেছে। লাবণ্যটা উবে গেছে। চোখের কোলে কালি। ওকে দেখে দীপুর মনে হোল কোন ব্যাপারে মেয়েটির মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়েছে।

—এসো মিতা, এসো, মনে মনে তোমার কথাই ভাবছিলাম। ওর সঙ্গে আর দেখা হোল?

—দেখা করছে না। কিন্তু,—বলে দীপুর দিকে তাকাল। দীপু স্যরি বলে উঠে দাঁড়াল,—বউঠান তোমরা কথা বল। আমি একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসি।

—সেই ভাল। জায়গাটাও দেখা হবে। আর পারলে তোমার দাদাকে ধরে নিয়ে এসো। সম্ভবত উনি থানার দিকে গেছেন।

—ওক্কে বউঠান। চলি।

দীপু বেরিয়ে যাবার পর স্বপ্না মিতার দিকে তাকাল। বেশ কিছুটা মনমরা ভঙ্গিতে মিতা চেয়ারে গিয়ে বসল। আগের কথার জের টেনে স্বপ্না জিগ্যেস করল,—দেখা করছে না কেন?

—তার নাকি কাজের খুবই চাপ।

—কিন্তু আগে তো এমন করতো না।

—বোধহয় তখন আমাকে ওর দরকার ছিল। আমি না থাকলে কার্যসিদ্ধি হচ্ছিল না।

—কিন্তু তোমরা তো দুজন দুজনকে ভালবাসতে।

boiRboi.net

—আগে আমার তাই মনে হোত।

—এখন হয় না?

—মাঝে মাঝে বড় সংশয় এসে সামনে দাঁড়ায়। এখন কেবলি মনে হয় আমার সঙ্গে ও বোধহয় নিজের কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির কারণে ভালবাসার অভিনয় করেছে। আজ বুঝতে পারছি, লোকটা আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছিল শুধুমাত্র ক্ষণপ্রভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে বলে!

—এ নিয়ে তুমি কোন অনুযোগ করনি?

—অনুযোগ করলে তিক্ততা বাড়বে। কিন্তু ভালবাসাটা ফিরবে না।

—এখন তুমি কি চাও?

মিতা কিছুক্ষণ পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটে। তারপর ধীরে ধীরে বলে,—আমি জানি, ও বিরাট অপরাধ করেছে। আইনের চোখে ক্রিমিন্যাল।

—তাহলে তুমি ওকে ধরিয়ে দিচ্ছ না কেন? অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়াও একটা অপরাধ।

—জানি স্বপ্না, জানি। কিন্তু,—

—কিন্তু?

—স্টিল আই লাভ হিম। আমি প্রয়োজনে ওর জন্যে সব কিছু করতে পারতাম। এখনও পারি।

—কিন্তু, স্বপ্না থেমে থেমে বলে, তুমি কী ওকে বাঁচাতে বা ফেরাতে পারবে? পারবে না। আমি বলি কি তুমি ওকে ভুলে যাও। আইনের চোখে ও কিন্তু একদিন দাগী আসামী হয়ে যাবে। ওর পক্ষে রেহাই পাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া নীলাঞ্জনদা কিন্তু ওকে ধরে ফেলেছেন। একটা সত্যি কথা বলবে মিতা?

—কী?

—দাদাকে উড়ো ফোনটা তুমিই করেছিলে। তাই না? এবং ওরই কথায়। মিতা মাথা নীচু করে কথা বলছিল। হঠাৎ ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

—ছেলেমানুষি কোর না মিতা? কাঁদলেই কি সমস্যার সমাধান হবে?

—কিন্তু, আমি যে বড় বোকামিটা করে ফেলেছি। এবং সেটা ওকে বিশ্বাস করে।

—হোয়াট? তুমি কী?

—হ্যাঁ স্বপ্না। আমি যে কনসিভ্ করে বসে আছি।

স্বপ্না বোকাটে মুখে চুপ করে যায়। তারপর এক সময় বলে,—একজন শিক্ষিতা মেয়ে হোয়ে তুমি এই ভুল করলে?

—মেয়েদের মন বড় নরম হয় স্বপ্না। নইলে ক্ষণপ্রভাই বা সব জেনেশুনে—

—সব জেনেশুনে মানে? ও কী তোমাদের ব্যাপার জানতো?

—সেই পরিচয় দিয়েই তো ওদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আমি ভাবি মেয়েরা কী করে মেয়েদের এতোবড় শত্রু হয়।

—ক্ষণপ্রভাকে তো তুমি চিনতে। তারপরেও কেন এ ভুল করলে?

—পারিবারিক সম্পর্কে ও তো আমার কাজিন সিস্টার। তাই, আমি যে ওকে বিশ্বাস করেছিলাম।

—বিশ্বাস নয়। নিজের দুর্বলতায় নিজেকে তুমি ওর কাছে সস্তা করে দিয়েছ। মেয়েরা তখনই হারায় যখন পুরুষের কাছে নিজের পার্সোন্যালিটি বিসর্জন দেয়। একটা কথা বলি, শুনবে?

—বল।

—বাচ্চাটা পৃথিবীর আলো দেখার আগেই,—

—না স্বপ্না, তা হয় না। মেয়ে হোয়ে এ কাজটা তুমি আমায় করতে বোলনা।

—বি প্র্যাকটিক্যাল মিতা। একজন মেয়ে হোয়েই বলছি, তোমার সেন্টিমেন্ট তোমাকে সুপুত্র দেবে না। আফটার অল তার রক্ত, রক্তের বিশ্বাসঘাতকতা, রক্তের নিষ্ঠুরতা আর চরিত্রহীনতা সব নিয়েই সে আসবে। কে বলতে পারে ভবিষ্যতে আর একটা ওই মানুষ জন্মাবে না। জিনটা যাবে কোথায়?

এই মুহূর্তে মিতার কান্না ছাড়া কোন গতি ছিল না। স্বপ্না জিগ্যেস করল, —বিশ্বদীপ এখন কোথায়?

—জানি না। আমাকে একটা ফোনও করে না।

—বেঁচে আছে?

—বেঁচে থাকবে। থাকতেই হবে। পাপের শাস্তি তো ভোগ করতেই হবে ভাই।

—কিন্তু বিশ্বদীপের উচিত নিজেকে সারেণ্ডার করে সবকিছু খুলে বলা। নইলে ওর পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়।

—জানি। কিন্তু খবরটা দোব কাকে? সে এখন কোথায়?

২০

—হোয়াট, বলে চিৎকার করে উঠলেন পুলিস অফিসার সত্যশোভন মজুমদার, এসব আপনি কী বলছেন মিস্টার ব্যানার্জি?

BanglaBook.org

—ঠিকই বলছি অফিসার, পুলিসের তরফ থেকে ঘর লক করার পরেও সে ঘর খোলা হয়েছিল এবং সিক্রেট চেম্বার খুলে যাবতীয় অর্থ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

—এরকম কখনও হয়? সেদিন আমরা যখন যাই, যা যা পাওয়া গিয়েছিল সেগুলোর সিজার লিস্ট তৈরি করে উপস্থিত কয়েকজনের সিগনেচার নেওয়া হয় সাক্ষী হিসেবে।

—এবার আপনার লিস্ট মিলিয়ে দেখুন সব জিনিস ঠিকমতো আছে কিনা? না নেই। সিক্রেট চেম্বারটা সেদিন আপনারা নজর করেননি। অবশ্য ওপর থেকে সেটা বোঝারও উপায় ছিল না। এবং সেই সিক্রেট চেম্বার থেকে যে অপহরণ হয়েছে তার প্রমাণ এই কাগজটা, বলে নীল ডিটিপি কম্পোজ করা চিরকুটটা এগিয়ে দেয় সত্যশোভনের দিকে।

—কিন্তু, সেদিন তো আপনি কিছুই জানালেন না, মানে যে রাত্রে ক্যামেরাটার ব্যাপারে এসেছিলেন।

—কেন, আপনার এস.আই. মিস্টার জগৎপ্রিয় কর কিছু বলেননি?

—ও হ্যাঁ, পরেরদিন চুরি যাওয়ার ব্যাপারে কিছু একটা বলছিল বটে, তবে ব্যাপারটা এতো সিরিয়াস সেটা আমি চিন্তাও করিনি। আসলে কেসটা ও হ্যাণ্ডেল করছে, আর আপনিও আছেন তাই বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছি না। কিন্তু আপনি যা বললেন সেটা তো ডেঞ্জারাস ব্যাপার।

—জগৎপ্রিয়বাবু কোথায়?

—ঝামেলা আফটার ঝামেলা। মন্ত্রী আর রাজনৈতিক দাদাদের হামলা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছি। জগৎপ্রিয়র কাঁধে এই সব ঘর গেরস্থালির খুন জখমগুলো চাপিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু এখন সেও সিক্।

—সিক্?

—হ্যাঁ। বুকে যন্ত্রণা হচ্ছিল। ডাক্তার বলেছে পনেরো দিনের মতো বেড রেস্ট। সম্ভবত মাইল্ড অ্যাটাক। এখন কোনদিক সামলাব?

—তার মানে জগৎপ্রিয়বাবুকে থানা কোয়ার্টারেই পাওয়া যাবে।

—হ্যাঁ তাই। কেন দেখা করবেন?

—নাহ্ থাক। আপনাকেই কটা প্রশ্ন করি। আপনারা যে রজতশীর্ষ নন্দীর ফ্ল্যাট লক করেন, সে চাবি কার কাছে থাকে?

—কেন, থানা লকআপে।

—দায়িত্ব নিশ্চয়ই আপনার?

—ন্যাচার‍্যালি।

—এই যে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা বেরিয়ে গেল, যদিও আনঅথরাইজড মানি, লীগ্যাল ক্লেমারও কেউ নেই। টাকাটা আদপেই যে ছিল সেটাও কেউ প্রমাণ করতে পারবে না, বাট চুরি তো হয়েছে। এটাই ফ্যাক্ট্। আজ যদি প্রশ্ন ওঠে, বা কোনভাবে জানাজানি হয় ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে বুঝতে পারছেন?

সত্যশোভনবাবু কিছুক্ষণ হাতের পেপারওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, তারপর বললেন,—ঘটনাটা খুবই সাংঘাতিক, আমি স্বীকার করছি। এ রকম কখনও হয় না। হবার কথাও নয়। মুশকিল হচ্ছে সর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে ওঝা ফ্যাঁসাদে পড়ে যায়। ব্যক্তিগতভাবে এবং গোপনে তদন্তটা আমাকেই করতে হবে। তবে—

—তবে?

—ঐ যে আপনি বললেন আনঅ্যাকাউন্টেড মানি, বলতে পারেন সবটাই ব্ল্যাক। কেউ ক্লেইম করলেও প্রমাণ করতে পারবে না ওখানে কি ছিল, কতটা ছিল।

—সেটা তো শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা। কোন্ যুক্তি দিয়ে নিজেদের অক্ষমতা এবং অপরাধকে অস্বীকার করবেন?

—না মিস্টার ব্যানার্জি, আমি সেটা অস্বীকার করতে চাই না। এটা থানার বদনাম, পুলিসের বদনাম। থানা ইনচার্জ হিসেবে আমার বদনাম। এখন বলুন কী করা যায়?

—সেটা পরে। তার আগে বলুন তো, জগৎপ্রিয় লোকটি কেমন?

—একটু আধটু ঘুষটুষ নেয় সেটা আমি বুঝতে পারি, তবে, আপনি কি সন্দেহ করেন, ওই একাজ করেছে?

—সন্দেহ আমি সবাইকেই করি।

—আমাকেও?

—কিছু মাইণ্ড না করলে বলতে হচ্ছে হ্যাঁ আপনাকেও। কারণ নন্দীদের ফ্ল্যাট থেকে সম্পদ অপহরণের সুযোগ সব থেকে আপনারই বেশি। জগৎপ্রিয়কে সঙের পুতুল বানিয়ে আপনিও কি পারেন না আসল কলকাঠি নাড়তে?

—মাই গড্, বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সত্যশোভন বললেন, বেশ, তারপর?

—জগৎপ্রিয় কি বিয়ে করেছে?

—কই তেমন তো কিছু শুনিনি।

boiRboi

—ওর কী কোন গার্লফ্রেণ্ড আছে? অথবা কারো সঙ্গে কী নিভ টুগেদার করে?

—এই রে, এইসব পার্সোন্যাল ব্যাপার আমি জানবো কী করে? তাছাড়া ও তো বছর দুয়েক হোল জগদ্দলে পোস্টিং পেয়েছে। ছিল জলপাইগুড়িতে। কি ব্যাপার বলুন তো, ইজ দেয়ার এনিথিং রং উইথ জগৎপ্রিয়? ওর সম্বন্ধে এতো খোঁজখবর নিচ্ছেন। আমি যতদূর জানি হি ইজ ওবিডিয়েন্ট অ্যাণ্ড সিনসিয়ার। অ্যাণ্ড মোটামুটি অনেস্ট। ছোটোখাটো ঘুষটুষ হয়তো নেয়, সেটা আমি গেইস করতে পারি। বাট, ও কিন্তু কাজ করতে ভালবাসে।

—শুধু জগৎপ্রিয় নয় আমি অনেকের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছি। এমন কি সেদিন যে যে কনস্টেবল আশ্রয় আবাসনে গিয়েছিল, যে ফটোগ্রাফার ছবি তুলেছে, ইভন্ আপনার সম্বন্ধেও আমার খোঁজখবর নেওয়া হয়ে গেছে।

—আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক মশাই।

—উপায় নেই। তবে জেনে রাখুন যদি না এই চুরির ব্যাপারে আমরা চোরকে ধরতে পারি, পাবলিক কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না। খবর একদিন ফাঁস হবেই। আপনার জগৎপ্রিয়ই একদিন হয়তো চেঁচামেচি করবে। আর মিডিয়া তো মুখিয়ে আছে। আপনাদের কাজে কোথাও কোন ফাঁক দেখলেই সেটা আরও মুখরোচক করে ছড়াবে।

—ঠিক আছে, আমি এদিককার ব্যাপারটা দেখছি, কিন্তু আপনার ওদিকের অবস্থা কদ্দূর সেটাই বলুন।

—বোলব। আর আমায় কটা দিন সময় দিন। তবে একটা কথা জেনে রাখুন কেঁচো খুঁজতে খুঁজতে সাপ বেরবে। আর সে সাপটিকে দেখে চমকে উঠবেন না যেন।

—সাপটিকে আপনি চিনতে পেরেছেন?

—সম্ভবত।

—তাহলে তাকে ধরছেন না কেন?

—সাপ ধরা কি অতো সোজা? সাপুড়ের বাঁশিটা ঠিকমতো বাজাতে হবে না?

—তা সেটা বাজান।

—বাজবে, বাজবে, ঠিক সময়েই বাজবে। ঠিক আছে আজ উঠি। আরও দু-একজনের সঙ্গে দেখা করার দরকার। ও হ্যাঁ, একগোছা লাভ লেটার পাওয়া গেছে।

—লাভ লেটার? মানে প্রেমপত্র? এখানে আবার প্রেমপত্র আসছে কোত্থেকে?

—খুব ডেঞ্জারাস প্রেমপত্র। ওর মধ্যেই আছে ক্ষণপ্রভা খুনের খুনির ঠিকানা। আর খুনি চেষ্টা করে চলেছে সেই প্রেমপত্রগুলো উদ্ধার করার। কোন্ খুনি আর ধরা পড়তে চায়?

—প্রেমপত্রগুলো কোথায় আছে?

—দুজনের মধ্যে যে কোন একজন মহিলার কাছে।

—তাদের চেনেন?

—বোধহয় চিনি।

—দেন দেয়ার লাইফস আর ইন ডেঞ্জার। নাম কি মেয়ে দুটির? একটা প্রোটেকসনের তো দরকার।

—পারটিকুলার মহিলার নাম কদিন পরে জানাব। আর প্রোটেকশন? হ্যাঁ সেটার তো দরকার। নইলে খুনি ধরা পড়বে কি করে?

—তার মানে?

—যে মুহূর্তে খুনি জানবে প্রেমপত্রগুলো কোন্ মহিলার কাছে রয়েছে, সে চেষ্টা করবে সেটা উদ্ধার করার। প্রয়োজনে সে মেয়েটিকে হত্যা করতেও ছাড়বে না। আপনার এখন একটাই কাজ, বেশ ফলাও করে সবার মধ্যে রটিয়ে দিন ক্ষণপ্রভা দেবী খুন হবার আগে একগোছা প্রেমপত্র জমা দিয়ে গেছে, এক মহিলার কাছে।

—এক মহিলা বললে খুনি তাকে কি করে চিনবে?

—চেনার চেষ্টা তো করবেই। একমাত্র খুনিই চিনবে কোন্ মহিলার কাছে চিঠিগুলো ক্ষণপ্রভা দেবী দিতে পারেন।

নীল বেরিয়ে আসছিল। সত্যশোভনবাবু বলে উঠলেন,—মিস্টার ব্যানার্জি সেই ভদ্রলোকের কোন খবর পেলেন? সেই যে বিশ্বদীপ ঘোষ না কি যেন নাম? লোকটা কি কর্পূর হয়ে গেল মশাই?

—সেটা বলতে পারবে একমাত্র খুনি মহাশয়। আর একটা কথা, জগৎপ্রিয়বাবুকে বলবেন ওকে আমি খুব মিস্ করছি। এই ক্রিটিক্যাল আওয়ারে ওকে আমার খুব দরকার ছিল। লোকটা খুব করিতকর্মা সেটা আপনি নিজেও স্বীকার করেন।

—আপনাকে বোঝা শক্ত মশাই। এইমাত্র লোকটাকে সন্দেহ করছিলেন, আবার তাকেই আপনি চাইছেন।

BanglaBook.org

হাসতে হাসতে নীল বলল,—আপনিও তো আমার সন্দেহের লিস্টে আছেন। তাই, বলে কি,

—বুঝেছি। আপনি কি ওর সঙ্গে দেখা করতে চান?

—সেটা কি সম্ভব? ভদ্রলোক তো ডাক্তারের নির্দেশে শয্যাশায়ী।

—তা ঠিক। তবে আপনার তেমন প্রয়োজন থাকলে, ঠিক আছে আমি একজনকে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে ওর কোয়ার্টারেই পাবেন।

সত্যশোভনবাবু একজন কনস্টেবলকে ডেকে পাঠালেন। জগৎপ্রিয়র কাছে যাবার আগে নীল বলল,—একটা লোককে আজকালের মধ্যেই অ্যারেস্ট করতে হবে।

—অ্যারেস্ট? কাকে?

—আশ্রয় আবাসনের কেয়ারটেকার নিশুতি সামন্তকে। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর ওকে চাপ দিলেই পেয়ে যাবেন।

—কী কী?

—খুনের দিন দুপুরে রজতশীর্ষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর একজন ভদ্রলোক, সম্ভবত ছদ্মবেশে ক্ষণপ্রভা দেবীর কাছে গিয়েছিলেন। ও বলবে ও সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। আমি ওর বন্ধু, পাশের আবাসনের কেয়ার-টেকার বঙ্কা, তার কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি আদপেই সেদিন ওরা সিনেমা দেখেনি। টিকিট না পেয়ে ফিরে এসেছিল। আপনাকে জানতে হবে যিনি গিয়েছিলেন নিশুতি তাঁকে চেনে, ভালো করেই চেনে, কে তিনি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, সেদিন রাত্রে রজতশীর্ষ বাড়ি থেকে বের হয়। সঙ্গে কি কেউ ছিল? আর তৃতীয় এবং ভাইট্যাল প্রশ্ন, সে কোন্ লোক যে পুলিসের লক ভেঙে রজতশীর্ষর ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল? এটা নিশুতির অলক্ষ্যে হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলে খুনি আপনার সামনে ভেসে উঠবে।

—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি জানেন?

—বোধহয় জানি।

—প্রশ্নগুলো আপনিও তো করতে পারতেন, নিশুতিকে?

—কিছু কিছু লোক আছে ঠ্যাঙানি না খেলে তাদের পেট থেকে কথা বের হয় না। বিশেষ করে পুলিসি ঠ্যাঙানি।

২১

মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা নিয়ে নীল গেল জগৎপ্রিয়র কোয়ার্টারে। লোকটা সত্যিই অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছে। ডাক্তারের বারণ, ফলে কোয়ার্টার ছেড়ে বের

হোতে পারছে না। মুখে তিনচার দিনের না কামানো দাড়ি। হাতে একটা উপন্যাস। যতো না পড়ছিল ভাবনায়িত চোখে তাকিয়ে ছিল জানলার বাইরে। নীল যেতেই ও বিছানার ওপর উঠে বসল,—দেখুন দিকি কী গেরো। আমাদের থানার আণ্ডারে কেস। এখনও পর্যন্ত কোন চার্জশীট তৈরি করা গেল না। আর যাবেই বা কোত্থেকে? দু দুটো খুন অথচ খুনির কোন হদিশ নেই।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে নীল বলল,—রজতশীর্ষ খুন হয়েছে এটা আপনি জানলেন কী ভাবে?

আচমকা প্রশ্নে জগৎপ্রিয় সামান্য বিব্রত হলো। পরক্ষণেই ও বলল,—নো। নট আই অ্যাম সিওর। তবে, কেসটা নিয়ে আমি ভাবছিলাম। ঠিক যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না, কেন রজতশীর্ষ আত্মহত্যা করবে? যে যাই বলুক, ওরা জোড়ের শালিক। আমার তা মনে হয় না। কোন পুরুষই ওই রকম বারমুখী মহিলা নিয়ে শালিকজোড় হোতে পারে না। আমার তো মনে হয় ভদ্রলোক চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর যে কোন ভাবেই মৃত্যু হোক।

—তার সঙ্গে আত্মহত্যার বা খুনের কী সম্পর্ক?

—আত্মহত্যা হোতে পারে স্ত্রীর অতর্কিত মৃত্যুর শোকে।

—আর কেউ যদি রজতশীর্ষকে খুন করে রেললাইনে ফেলে আত্মহত্যা বলে চালাবার চেষ্টা করে। তার কী মোটিভ?

—গণ্ডগোলটা তো সেখানেই। রজতকে খুন করতে হোলে তাকে রেললাইনে টেনে নিয়ে যাবে কেন? বাড়িতেই তো করতে পারতো।

—তার মানে, খুন নয়। আত্মহত্যা। অঙ্ক কী তাই বলে?

—কি জানি মন ঠিক মানতে চাইছে না। তার ওপর পি. এম রিপোর্ট, রগে শক্ত কিছুর আঘাত ছিল। একজন লোকের ওপর আমার খুব সন্দেহ। দ্যাট বিশ্বদীপ ঘোষ। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে স্বামীস্ত্রীর সঙ্গে ওর কোন সংঘাত হয়। ফলে দুজনকেই ও মেরে দিয়ে টাকাকড়ি যা পেয়েছে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

—তাহলে কিন্তু বিশ্বদীপকে পুলিসের তালা ভাঙতে হবে। একদিন তাল বুঝে তাকে বন্ধ ফ্ল্যাটে আসতে হবে। এবং সবকিছু বাগিয়ে সবার অলক্ষ্যে পালাতে হবে।

—একজন হেল্প করলে কাজটা খুব শক্ত নয়।

—নিশুতি?

—কেন নয়? ওর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কোন এক রাত্রে তালা খুলে সবকিছু নিয়ে সবার অলক্ষ্যে চলে যাওয়া কী খুব অসম্ভব ব্যাপার?

BanglaBook.org

—না, তা হয়তো নয়। কিন্তু পুলিসের তালার চাবি? সে কোথায় পাবে?

—হুঁঃ, বলে ব্যাঙ্কের ভল্ট ভেঙে ধনদৌলত হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। ডুপ্লিকেট চাবি কী করতে আছে? সেটাও নিশুতির সাহায্যে করিয়ে নিয়েছে।

—তাহলে তো নিশুতিকে অ্যারেস্ট করতে হয়।

—সত্যশোভনদা বা আপনি যে কেন এখনও বসে আছেন বুঝি না। থানায় নিয়ে উত্তম মধ্যম দিলেই সব হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসবে। অ্যাটলিস্ট আমি সুস্থ থাকলে তাই করতাম।

প্রসঙ্গ পাল্টে নীল বলল,—শুনেছেন কি, ক্ষণপ্রভা দেবী মৃত্যুর আগে একগোছা প্রেমপত্র তুলে দিয়ে গেছেন কোন একজনের হাতে।

—প্রথম প্রশ্ন কার প্রেমপত্র এবং কিসের প্রেমপত্র? দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রেমপত্রের সঙ্গে এইসব খুনখারাপির কী সম্পর্ক?

—ভয়ানক প্রেমপত্র। তার মধ্যেই আছে ক্ষণপ্রভাকে একজন খুন করার হুমকি দিয়েছে।

—প্রেমপত্রে খুনের হুমকি?

—ও কী শুধুই প্রেমপত্র? প্রেমপত্র মানেই কিছু গোপনীয়তা। তা গোপনীয়তার মধ্যে গোপন হুমকি থাকতে পারে।

শুনে খানিকক্ষণ গুম মেরে রইল জগৎপ্রিয়। তারপর বলল,—বলিহারি প্রেম আর বলিহারি খুন। মাথায় ঢোকে না মশাই। তা কার কাছে তিনি সেগুলো দিয়ে গেছেন?

—বোঝা যাচ্ছে না। দুটি মেয়ে। আবাসনের ঊর্মিলা ভট্টাচার্য আর 'সৃজনমায়ার' মিতা দাস। যারা রেগুলার ওর কাছে যাতায়াত করতো।

—রেগুলার যাতায়াত করতো? তারা কারা?

—খোঁজ রাখেননি?

—আমি কী ক্ষণপ্রভাকে চিনি? নাকি তার ফ্ল্যাটে কোনদিন মানে বিফোর হার ডেথ, গেছি?

—তা বটে।

—কিন্তু আপনি প্রেমপত্রের খবর কী করে পেলেন?

—যেমন করেই হোক খবরটা আমার কাছে এসেছে।

—আই সি। তা প্রেমপত্রগুলো কি এখনও তার কাছে আছে?

—সেটাই তো খোঁজ নিতে হবে।

—আসল মেয়েটি কে?

—সঠিক জানি না।

—তাহলে ওদের দুজনকেই ইন্ট্যারোগেট করুন। অ্যারেস্ট করুন।

নীল হাসল,—ক্ষেপেছেন মশাই। কে কার প্রেমপত্র কাকে দিয়ে গেল, তাই নিয়ে কি তাকে অ্যারেস্ট করা যায়? এবং কথাটা আদপেই সত্যি কিনা কে জানে। এই যে আমি আপনার ঘরে এসেছি। আমি চলে যাবার পর ধরুন আপনি মার্ডার হয়ে গেলেন। তার মানে কী আমি আপনাকে খুন করেছি?

—তাহলে এখন কি করবেন?

—আপনি আগে সেরে উঠুন। তারপর দেখা যাক কি করা যায়।

ইতিমধ্যে জগৎপ্রিয় ফ্রেঞ্চটোস্ট আর চায়ের অর্ডার দিয়েছিল। খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে নীল আচমকা জিগ্যেস করল,—আপনি কী কারো সঙ্গে প্রেম করছেন?

হো হো করে হেসে উঠে জগৎপ্রিয় বলল,—নামটা আমার জগৎপ্রিয় হোলেও জগতের কোন মেয়েরই প্রিয় হোতে পারলাম না। না মশাই, ও আমার দ্বারা হবে না।

—তাহলে অন্তত একটা বিয়ে করুন। কতদিন আর আইবুড়ো হোয়ে ঘুরবেন?

ম্লান হেসে জগৎপ্রিয় বলল,—আমাদের চাকরি খুবই খতরনাক চাকরি। তার ওপর এইতো দেখুন না। একটা মাইল্ড অ্যাটাকও হোয়ে গেল। মানে অ্যালার্ম দেওয়া হোল। নাহ্, কী দরকার একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে। এই বেশ আছি।

আর কিছু না বলে নীল বাইরে বেরিয়ে এলো। কিন্তু ও জানতো না আর একটু পরেই ওর সামনে আলিবাবার দরজাটা খুলে যাবে। ওর বহু প্রত্যাশিত সেই লোকটিকে ও পেয়ে যাবে, যার নাম বিশ্বদীপ ঘোষ। কাকতালীয় শব্দটা বোধহয় সর্বদাই কাকতালীয় নয়। অন্তত সেই মুহূর্তে নীলের তাই মনে হোল।

—একস্‌কিউজ মী স্যার। আপনিই তো মিস্টার নীলাঞ্জন ব্যানার্জি? ক্ষণপ্রভা নন্দীর খুনের কেসটার তদন্ত তো আপনিই করছেন?

ঘুরে তাকাতেই নীল দেখল বেঁটেখাটো এবং হৃষ্টপুষ্ট চেহারার একটি লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধ ছাড়ানো ব্যাকব্রাশ করা চুল। গালে চাপ দাড়ি। চোখে সরু কালো ফ্রেমের গোল চশমা। গায়ে সিল্কের মেটে রঙের পাঞ্জাবি। পরনে আলিগরি পাজামা। পায়ে চপ্পল। কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা। সব মিলিয়ে কবি-কবি চেহারা। ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে নীল বলল,—হ্যাঁ তাই। কিন্তু আপনাকে তো,—

ভদ্রলোক সিগারেট খাচ্ছিলেন। পরের টানটি সবে দিতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে নীলের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো,—মাই গড। আপনি এখনও বেঁচে আছেন?

—আপনি আমাকে চেনেন?

—এইমাত্র চিনলাম। অবশ্য ছবির দেখা থেকে নয়। ছবিতে কোন দাড়ি ছিল না। আর চুল ব্যাকব্রাশ করা এবং ছোট ছোট। চশমার ফ্রেমটাও পাল্টেছেন। ছবিতে আপনি পরে ছিলেন হাতকাটা অলওপ্ন্ শার্ট আর প্যান্ট। এখন চুল আর দাড়িতে আপনাকে অন্যরকম লাগছে। কিন্তু ধরা পড়লেন অন্য একটা জায়গায়।

—জানি তো। আপনার কাছে তো নিজেকে লুকাবার জন্যে আসিনি। তাই অনামিকাহীন ডান হাতটা লুকোবার প্রয়োজন মনে করিনি।

—বিশ্বদীপবাবু, আমি তো আপনাকে গরু খোঁজা খুঁজছি। এবং পুলিসের কাছেও আপনি মোস্ট ওয়ান্টেড পার্সন। তবে আমার ভয় ছিল আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবার আগেই আপনাকে না মেরে দেওয়া হয়। অ্যাটলিস্ট্ আমাকে যখন ফোনে থ্রেট্ করা হয় তখন এমনই একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। এনিওয়ে, বলুন, আপনার কি বলার আছে? তারপর আমার অনেক প্রশ্ন, যেগুলো আটকে আছে আপনাকে না পাওয়ার জন্যে।

—কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে তো সব কথা হবে না। তারপর, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মাই লাইফ ইজ অ্যাট স্টেক।

—কোথায় যাবেন বলুন? এদিকে তো আমার সবকিছু চেনা নেই।

—একজন বিশেষ লোকের চোখ সর্বত্র ঘোরাফেরা করে। কে জানে এই যে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলছি এটাও সে জেনে ফেলেছে কিনা।

—হ্যাঁ তাই। সেটা আমিও গেইস করতে পারি। সেই জন্যেই,—

—এখানে আমার একটা ডেরা আছে। একটা ছোট ঘর। সেখানে যেতে পারি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

—নো, নট অ্যাট অল। চলুন।

—কিন্তু একসঙ্গে নয়। আমি এগিয়ে যাব। তারপর আপনি আপনার মতো করে আমাকে ফলো করে চলে আসুন।

—বেশ তাই।

বিশ্বদীপ সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এগিয়ে গেল। নীলও একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে বিশ্বদীপের পিছু নিল।

২২

তিনজনেই হাপিত্যেশ করে বসেছিল। স্বপ্না, শ্যামচাঁদ আর দীপু। স্বপ্না উদ্বিগ্ন। শ্যামচাঁদ ভাবছে নীলদার আবার কোন বিপদ-আপদ হোল না তো? আর দীপু? রাগে থম্‌থম্ করছে। যেদিন থেকে সে নীলের সাগরেদ হয়েছে কোনদিনও ঠিক এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। সকালে জগদ্দলে পৌঁছে তাকে স্বপ্নাদের বাড়িতে ফেলে দিয়ে একাই কোথায় বেরিয়ে গেছে। চাপা রাগ আর অভিমানে সে তার খুনসুটি করাটাও ভুলে গেছে। নীল বাড়ি আছে বলে শ্যামচাঁদ কাজ থেকে ফিরে আর কোথাও বের হয়নি। তারপর থেকে অপেক্ষা, অপেক্ষা আর অপেক্ষা।

নীল ফিরল রাত নটায়। ক্লান্ত, অবসন্ন। কিন্তু মুখে প্রাপ্তির প্রসন্নতা। শ্যাম কিছু বলতে যাচ্ছিল। ওকে থামিয়ে স্বপ্না গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়তে পড়তে বলল,—মানুষটা সারাদিন পর বাড়ি ফিরছে। আদপেই সারাদিন ভালো করে খাওয়া জুটেছে কিনা কে জানে। ওঁকে একটু জিরোতে দাও। তারপর যা বলার বোল। দাদা, আগে আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসুন। চানও করে নিতে পারেন। আমি আলাদা করে আপনার জল ভরে রেখেছি।

—কেন, তোমাদের এখানে জলের খুব ক্রাইসিস?

—না, তা নয়। এতো রাতে টিউবওয়েল ছেঁচে জল তুলতে হবে। খুব ঠাণ্ডা জল। আপনার সহ্য নাও হোতে পারে। আপনি যান। আমি ততক্ষণে খাবার গরম করি।

নীল সত্যিই খুব টায়ার্ড হয়ে গেছিল। ও সোজা চলে গেল কলঘরে। ফিরে এসে দেখল চা আর বাড়িতে তৈরি মাংসের সিঙাড়া সাজিয়ে বসে আছে স্বপ্না।

একটা সিঙাড়া তুলে কামড় দিতে দিতে নীল বলল,—স্বপ্নার মতো যদি আমার একটা বোন থাকতো। এই বুড়ো বয়েসে আর অন্য কিছু ভাবতে হোত না।

—আপনি তো আমার দাদাই। নাকি পাতানো বোন ভেবে বসে আছেন?

—এইতো সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করলে? নারে বাবা না, প্রথমদিন থেকেই তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। এবং সেটা হয়েছিল তোমার আন্তরিকতার জন্যে। যাকগে খুব খিদে পেয়েছিল। দীপু জানে ইদানীং আমি বাইরের খাবার খাচ্ছি না।

—তার মানে, শ্যামচাঁদ বলল, সারাদিনে চা আর সিগারেটের ওপর দিয়েই চলেছে?

—না, জগৎপ্রিয় ফ্রেঞ্চ টোস্ট আর চা খাইয়েছিল। ওর কোয়ার্টারের নিমাই কনস্টেবল নিজের হাতে বানিয়েছিল। বেচারি মাইল্ড অ্যাটাকে শুয়ে পড়েছে।

পুলিসের ওপর শ্যামচাঁদের বোধহয় জাতক্রোধ। ও বলল,—পুলিসের হার্ট অ্যাটাক হয়?

—কেন হবে না? পুলিস কী মানুষ নয়?

—হ্যাঁ মানুষ। তবে কতটা মান আর হুঁস আছে সেটা ভাবতে হবে। ভাবতে হবে না একটা জিনিস। সেটা হোল ওদের কোন হার্ট বলে কিছু নেই। তাই ওদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও নেই।

শ্যামচাঁদের কথা বলার ধরনে দীপু বাদে বাকি তিনজন হেসে ফেলল। দীপুর ব্যাপারটা নীল বুঝতে পারল। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি টেনে নীল বলল,—কি রে কথা বলছিস না কেন? রাগ হয়েছে?

—হ্যাঃ! দীপু সেনগুপ্তর রাগের মূল্য কতটুকু? আর সেই অতটুকু রাগ দেখতে নীল ব্যানার্জির সময় কোথা?

—বুঝেছি। উপায় ছিল না রে? আজ একটু একা বেরনোর দরকার ছিল। সত্যশোভন মজুমদার আর বিকাশ তালুকদার এক লোক নয়। মুখে যতই সত্যশোভনবাবু হেঁ হেঁ করুন না কেন, আমি এসে ওদের কেসটার তদারকি করছি সেটা ঠিক প্রাণ খুলে নিতে পারছেন না। জানি এটা খুবই স্বাভাবিক। প্রফেশনাল ইগোর ব্যাপার। তার ওপর আজ আবার ডিরেক্টলি উনিও আমার সন্দেহের তালিকায় আছেন, সেটাও জানিয়েছি। ন্যাচারালি,—

দীপু অধৈর্য। সিগারেট ধরিয়ে বলল,—তোমার রাজকার্যে যে কিছুটা সাকসেস এসেছে সেটা তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তা অধমদের কী তা পরিবেশন করা যায়?

কিছু না বলে নীল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। একটা সিগারেট ধরাল। তার মুখের মিটিমিটি হাসিটা তখনও লেগে আছে। একসময় বলল,—একটা গল্প শোন। তোমরা সকলেই শোন। গল্পটা হচ্ছে তিন বন্ধু আর এক মক্ষীরানীর গল্প। না, কোন পাত্র পাত্রীর নাম আমি করব না। তবে গল্পটা শোনার পর তোমাদের কাছে মোটামুটি নায়ক নায়িকা ক্লিয়ার হোয়ে যেতে পারে।

—তাহলে আর দেরি কেন? শুরু করুন দাদা, বলে শ্যামচাঁদ জমিয়ে বসল।

—কিন্তু তোমার তো কাল কাজে বেরতে হবে।

—কাল রবিবার দাদা। ভুলে গেলেন?

—তাও তো বটে। তাহলে শোন, তিন বন্ধু। খুব ছোট বয়েস থেকেই তারা বন্ধু। কিন্তু তাদের তিনজনের সামাজিক স্টেটাসের মধ্যে ফারাক ছিল। যদিও তারা সেভাবে নিজেদের দেখতো না। এদের মধ্যে ধর একজনের নাম রাম, একজন শ্যাম আর একজন যদু।

শ্যামচাঁদ ফোঁস করে উঠল,—শ্যামের নামটা পাল্টানো যায় না?

—এ শ্যাম তুমি নও। আর ওটা ছন্দ মেলানোর জন্যে। যাই হোক, রাম ছিল ধনী বাপের একমাত্র ছেলে। শ্যাম মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। আর যদু ওদের তুলনায় অনেক নীচে। কারণ যদুর বাবা ছিলেন কেরানি। বাবার সাতটি সন্তানের একজন। নিতান্তই গরীব। কিন্তু তিনজনেরই বড়লোক হবার নেশা ছিল।

—কিন্তু, দীপু বলল, রাম তো বড়লোক বাবার একমাত্র ছেলে।

—ছেলে একমাত্র কিন্তু ওর ওপরে আরও তিন বোন ছিল। যদিও তারা বিবাহিত। তবুও বাপের উইলের দৌলতে সে সম্পত্তি চারভাগে ভাগ হোয়ে যাবে। তাই তার স্বোপার্জিত অর্থে বৃত্তবান হবার বাসনা বরাবরের।

স্বপ্না বলে উঠল,—তারপর?

—হ্যাঁ তারপর? শ্যাম একটা চাকরি করে। আর যদু নানান জায়গায় ইণ্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছে। আর তিনজনেই স্বপ্ন দেখছে এমন একটা কিছু রাস্তা বার করতে হবে যাতে তারা জীবনে অনেক অনেক টাকার মালিক হোতে পারে। এরই মধ্যে হোল একটা কাণ্ড। তাদের তিনজনের জীবনে দেখা দিল একটি সুন্দরী রমণী।

—মানে মক্ষীরানী? দীপুর সংযোজন।

—বলতে পারিস। ঐ বয়েসেই মেয়েটির অনেক ছেলে বন্ধু। আসলে মেয়েটির বোধহয় মেয়ে অপেক্ষা পুরুষ সঙ্গই বেশি পছন্দের ছিল। আলাপ পরিচয় হবার পর, তাদের স্বপ্ন দেখার গল্প শুনে মেয়েটি মনে মনে বেশ কৌতুক বোধ করল। সেও কেমন যেন ওদের তালে পা ফেলা শুরু করল। এদের মধ্যে শ্যাম ছিল সব থেকে ইনটেলিজেণ্ট। মক্ষীরানীর সঙ্গে তার একটা পারিবারিক রিলেশনও ছিল। সে কথায় পরে আসছি। শ্যাম যদিও একটা চাকরি করতো, কিন্তু তার কূটমাথা থেকে নানান রকম আইডিয়া বেরতো, যেগুলো সাকসেসফুল করতে গেলে আর সহজ পথে হাঁটা হোয়ে ওঠে না। তার বর্ণিত রাস্তাটাই ছিল গোলমেলে। আমি অতো ডিটেলসে যাচ্ছি না, কিন্তু তার প্রস্তাবিত পথে হাঁটা শুরু করে তিনজনেই বেশ কিছু ভালোমন্দ রোজগার পেতে লাগল। ইতিমধ্যে যদুও একটা চাকরি পেয়ে যায়।

—আর মেয়েটি?

—মেয়েটি একই সময়ে তিন যুবকের সঙ্গে প্রণয়ের খেলা খেলতে শুরু করল।

—সেকি? সেটা তো ঠিক নয়।

নীল বলল,—হ্যা স্বপ্না, এমনটিই ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। পৃথিবীতে বহু মানুষের বিচিত্র সব হবি আছে। কেউ দেখবে স্ট্যাম্প কালেকশন করছে। কেউ বা মুদ্রায় আসক্ত। কেউ আবার নানা ধরনের নানা অভিব্যক্তির গণেশের মূর্তি এনে সাজিয়ে রাখে। তাদের দেরাজে। আমাদের মেয়েটির একটি অদ্ভুত শখ। অদ্ভুত মানসিকতাও বলা যায়। লাভ লেটার কালেকশন করা। জীবনের প্রথম প্রেমপত্র থেকে আরম্ভ করে শেষ প্রেমপত্রটাও সে সযত্নে ডাকটিকিটের মতো করে তার অ্যালবামে ভরে রেখে দিতো। এটাকে ঠিক কি ধরনের বিলাস বলে জানি না। তবে হবি হিসেবে বিচিত্র। এবং সেটা তার গোপন ভাণ্ডারেই জমা থাকতো।

একদিন দেখা গেল রাম শ্যাম যদু, তিনজনেই তাদের প্রাণের আকুতি জানিয়ে অন্যের অগোচরে মক্ষীরানীকে প্রেমপত্র দিয়েছে। মক্ষীরানী তিনজনের সঙ্গেই সমানতালে প্রেমের অভিনয় করে যায়। একসময়ে সেটি তিন বন্ধুর কাছে ফাঁস হয়ে যায়। এবং তখনই প্রকাশ পায় মক্ষীরানীর সঙ্গে ইনটিমেসিটা বেশিদূর গড়িয়ে গেছে যদুর সঙ্গে। আসলে তিন বন্ধুর মধ্যে যদুরই ছিল সুঠাম স্বাস্থ্য। অপেক্ষাকৃত গরীবের ছেলে হোলেও তার মধ্যে যে স্পোর্টস্‌ম্যানশীপ ছিল সেটাই মক্ষীরানীর সবথেকে ভালো লেগেছিল। ছেলেটি প্রচণ্ড সাহসী আর ডেসপারেট।

—তার মানে বসুন্ধরা চিরদিনই বীরভোগ্যা?

—কিন্তু দীপু, শেষপর্যন্ত সেটা তো হোল না। ও হ্যাঁ তার আগে আর একটা কথা, শ্যাম একদিন তিন বন্ধুকে জানালো, তারা একটা বড় দাঁও মারতে পারে। গণেশ ওল্টানো কারবার। কিন্তু সেই কারবারের অংশীদার হোলে মাস চার পাঁচেকের মধ্যে তারা প্রচুর পয়সার মুখ দেখতে পাবে। অবশ্যই সেই কারবারে কমপক্ষে প্রতি পার্টনারকে এক লক্ষ করে টাকা ইনভেস্ট করতে হবে।

—কারবারটা কিসের, দীপু জানতে চাইল।

—এক্ষেত্রে সেটা আমাদের গল্পের কোন বিষয়বস্তু নয়। তাই ওটা নিয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু ব্যাপারটা দুনম্বরি। সোজা পথের কোন রোজগার নয়। স্পষ্টই বেআইনি।

—আর মক্ষীরানী?

—ব্যবসায় তার কোন ইন্টারেস্ট ছিল না। সে কেবল সমান তালে তিনজনকেই খেলিয়ে যাচ্ছে।

—তারপর?

—রামের এক লক্ষ টাকা যোগাড় করতে অসুবিধা হয়নি। শ্যামও টাকাটা যোগাড় করে ফেলেছিল। আটকে গিয়েছিল যদুর ক্ষেত্রে। কিন্তু এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে চার পাঁচ মাসের মধ্যে মিনিমাম পার হেড পাঁচ লক্ষ টাকা ঘরে আসবে, এটার সুযোগ সে ছাড়তে পারল না। কারণ সেই সময় তার স্বপ্নসুন্দরী তাকে পাগল করে দিয়েছে। সে স্বপ্ন দেখেছিল, পাঁচ লক্ষ টাকা ইনকামের পরই সে স্বপ্নসুন্দরীকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। বোধহয় স্বপ্নসুন্দরীর আপত্তি ছিল না। মায়ের গয়না, বোনের বিয়ের জমানো টাকা আর বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায় এক লক্ষ টাকা পূরণ করে সে শ্যামের হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু তোদের আগেই বলেছি বুদ্ধিতে অন্য দুজনের চেয়ে শ্যাম ছিল মারাত্মক রকমের চালাক। আর তার মধ্যে লোক ঠকানোর প্রবণতা ছিল সব থেকে বেশি। শেষপর্যন্ত লোকদেখানো ব্যবসা একটা হয়েছিল। শ্যামের ফক্কিকারিতে ভুলে অনেক মানুষ তাদের অনেক টাকা শ্যামদের কোম্পানিতে জমা দিয়েছিল। আর ঠিক পাঁচ মাস পর সে কোম্পানি নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী লালবাতিও জ্বেলেছিল। কিন্তু ততদিনে শ্যাম নামক চিড়িয়াটি পুরো টাকা আত্মসাৎ করে হাওয়া। শুধু সে একা নয়। সঙ্গে মক্ষীরানী। দুই বন্ধুর অলক্ষ্যে মক্ষীরানীকে বিয়ে করে সে পগার পার। এবং পরে জানা যায় রাম আর যদুর সঙ্গে প্রেম করাটা একটা ধোঁকা। প্রেমের মায়াজাল ছড়িয়ে আসল ব্যবসা থেকে দুজনকে দূরে সরিয়ে রাখা। শ্যামের সঙ্গেই তার প্রেম ছিল। এবং লোকদেখানো ব্যবসাটা ছিল শ্যাম আর মক্ষীরানীর ষড়যন্ত্র।

রাগে দুঃখে রাম দলত্যাগ করে। আর যদু? মাথার ওপর একরাশ দেনা। মায়ের গয়না, বোনের বিয়ের আর বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা। এবং সব থেকে বড় কথা মক্ষীরানীর প্রবঞ্চনা। যদুর বুকে সেদিন থেকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে শুরু করে।

সে প্রতিজ্ঞা করে শ্যাম আর মক্ষীরানীকে সে একদিন কোথাও না কোথাও খুঁজে পাবে। এবং সেদিন তাদের ধনেপ্রাণে মারবে।

নীল থামতেই দীপু বলল,—গুরু এ তো তোমার রজতশীর্ষ আর ক্ষণপ্রভার গল্প বলছ।

boiboi.net

—হ্যাঁ রে ঠিক তাই।

—কিন্তু তুমি জানলে কী করে এতো কিছু?

—আজ যে রামের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাকতালীয় বলতে পারিস। আসলে কী জানিস, পাওয়ার ইচ্ছেটা যদি জেনুইন হয়, মানে মনে প্রাণে যদি কিছু চাওয়া যায়, ভাগ্য তাকে খুব একটা বিট্রে করে না। যেমন আজ হোল।

—ইন্টারেস্টিং, ইন্টারেস্টিং, বলে শ্যাম নড়েচড়ে বসল। তারপর বলল, নীলদা আপনার রামই বা কে? আর যদুও বা কে? বেশ বোঝা যাচ্ছে রজত আর ক্ষণপ্রভাকে বাগে পেয়ে যদুই তাদের খুন করেছে। আপনি কি চিনতে পেরেছেন? যদু লোকটা কে? কোথায় থাকে?

—তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলি, যদুকে আমি চিনতে পেরেছি। রাম যদি এই গল্পটা না বলতো, তাহলে যদুকে হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থাটা করতে পারতাম না।

—কি করে ধরবেন? হাতেনাতে?

—ঐ যে প্রেমপত্র। ক্ষণপ্রভার লাভ লেটার অ্যালবামে খুনি যে তার খুনের প্রমাণ রেখে গেছে। এখন খুনি কিছুতেই চাইবে না সেই অ্যালবাম আর কারো হাতে পড়ুক।

—সেই অ্যালবাম এখন কোথায়?

—আজ সারাদিনে অনেক চার ছড়িয়েছি। আন্দাজে অনেক ঢিলও ছুঁড়েছি।

—কারো গায়ে লেগেছে?

—কথায় আছে না, পড়ল কথা হাটের মাঝে যার ব্যথা তার বুকে বাজে। অ্যাণ্ড আই থিঙ্ক সেটা বাজছে। ভালো করেই বাজছে। আর অচিরেই সেই বাজনাটা তোরা শুনতে পাবি।

—তা চারগুলো কি?

—প্রেমপত্র বা ডায়েরি এরকম একটা কিছুর সন্ধান আমার পাবার দরকার ছিল। সাধারণত যারা বহু প্রেমের মধ্যে জড়ায় তাদের দুটো প্রবণতা থাকে। এক তাদের জীবনের অ্যাফেয়ার্সগুলোকে লিপিবদ্ধ করে রাখা। এটা এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি। এক ধরনের অহমিকা। রূপের অহমিকা। তার রূপের আগুনে কত পতঙ্গ বা কত মক্ষিকা ঝাঁপ দিয়েছে আর পুড়ে মরেছে সেই ফিরিস্তির রোমন্থন করা, অবসর বিনোদনের জন্যে। তাই আমি প্রথম থেকেই ডায়েরির খোঁজ চালাচ্ছিলাম। কিন্তু পাইনি। হঠাৎ সেদিন কাগজে দেখলাম একটি মেয়ের হবি প্রেমপত্র কালেক্ট করা। এও একধরনের রোম্যান্টিক বিলাস। আর তখনই আমার মনে হোল আমাদের মক্ষীরানী নিশ্চয় তার দীর্ঘদিনের নানা প্রেমের নমুনা

কোন ঝাঁপির অন্তরালে রেখে গেছে। আর সেকথা রামবাবু আজ স্বীকারও করেছে।

—তা সেগুলো এখন কোথায়?

—রামবাবুর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সেগুলো আছে ক্ষণপ্রভার অন্তরঙ্গ কোনও মহিলার কাছে।

—হঠাৎ কোন এক পরিচিতা মহিলার হাতে কেন তিনি প্রেমের ঝাঁপি তুলে দেবেন?

—কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে কোন মুহূর্তে তার মৃত্যু হোতে পারে।

—কি করে বুঝলেন?

—ওই প্রেমপত্রের ঝাঁপি। ওরই মধ্যে ছিল একটা মারাত্মক চিঠি। যে চিঠিতে খুনি তার খুনের প্রমাণ রেখে গেছে। এখন ওই সর্বনাশা চিঠিটা যেমন করেই হোক সে উদ্ধার করতে চাইবে।

—কিন্তু সে মহিলাটি কে? যার কাছে ক্ষণপ্রভা চিঠির বাণ্ডিল তুলে দিয়ে গেছেন?

—সম্ভবত খুনি তাকে চিনতে পেরেছে।

—রাম না যদু?

—দু'জনের মুখেই আমি দুটো ছায়া দেখেছি। অনেকদিনের পর শ্যামকে খুঁজে পেয়ে দুজনেই ফের শ্যামের সঙ্গে যোগ দেয়। এবং দুজনের উদ্দেশ্য ছিল একটাই। সেটা হোল প্রতিহিংসা। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি। এদের মধ্যে একজন নরমপন্থী আর একজন চরমপন্থী। তবে মহিলাকে দুজনেই চেনে।

—তা তো হোল, প্রেমপত্রের ব্যাপারটা তোমার অনুমান। অর্থাৎ তুমি ধরে নিচ্ছ সেগুলো ক্ষণপ্রভা কাউকে দিয়ে গেছেন।

—এ অনুমানটা যে সত্যি সেটা আগেই তো বললাম। রামবাবু স্বীকার করেছেন। কিন্তু সে কোন্ মহিলা তার জন্যেই তো গুলের টোপ ছড়াতে হয়েছে। অবশ্য এতে মহিলার জীবন বিপন্ন হোতে পারে।

স্বপ্না চোখ বড়োবড়ো করে জিগ্যেস করে,—একজন মহিলার জীবন বিপন্ন, আর আপনি নির্বিকার হয়ে আছেন?

—কে বলল, আমি নির্বিকার। তার আগে স্বপ্না, তুমি বল তো মিতা দাস তোমায় কি বলল?

—মিতা দাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তা আপনি জানলেন কেমন করে?

—ও যখন তোমার বাড়ি ঢুকছে তখনই দেখি। অনেক কিছু আমার মাথায় ফ্ল্যাশ করে গেছিল। এবার বলো ওর কাহিনী।

অতঃপুর স্বপ্না আগাগোড়া সব কিছু নীলকে জানালো। এমন কি তার অবৈধ সন্তানটির কথাও।

নীলের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। একটু বিস্মিত হয়ে স্বপ্না জিগ্যেস করল,—মিতার কথা শুনে আপনাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে।

—মেয়েটাকে চিনতে পারছিলাম না। ঊর্মিলা না মিতা? এবার চিনলাম। তাই তৃপ্তির হাসি। কারণ আসল খেলা এবারই শুরু হবে। খুনির কানে দুটো কথা বেশ ভালোভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি। এক নম্বর কোন এক মহিলার কাছে ক্ষণপ্রভা মৃত্যুর আগে একগোছা প্রেমপত্র দিয়ে গেছে। অন্তত খুনি তার মরণবাণটি উদ্ধার করার জন্যে মেয়েটির কাছে আসবেই। আরও একটা কথা আন্দাজে ছুঁড়তে হয়েছে। ঠিক ভিত্তিহীন আন্দাজ নয়, অবধারিত অনুমান।

—সেটা কি? স্বপ্নাই প্রশ্ন করে।

—নিশুতি জানে আসল খুনি কে? টাকা খেয়ে নিশুতি মুখ বন্ধ করে রেখেছে। ওকে অ্যারেস্ট করতে বলে এসেছি।

—কে অ্যারেস্ট করবে? পুলিস?

—হ্যাঁ। অ্যারেস্ট করার অধিকার তো একমাত্র পুলিসেরই আছে। মিস্টার মজুমদার তাকে অ্যারেস্ট করার দায়িত্ব নিয়েছেন। অবশ্য আর একটা ভয় আছে। লকাপেই তার মৃত্যু হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

—সেকী? কেন?

—আমার বদ্ধমূল ধারণা বিয়িং আ কেয়ারটেকার সব আশ্রয় আবাসন সব কিছুই ওর জানা। ও জানে সেদিন তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটা কি ছটার মধ্যে ক্ষণপ্রভার ঘরে কে এসেছিল। আমার বিশ্বাস রজতশীর্ষ নন্দী আত্মহত্যা করেনি। যে কোন ভাবেই হোক লোকটা ছটা নাগাদ ঘরে ফিরে ক্ষণপ্রভাকে নিহত দেখে আপসেট হয়ে পড়েছিল। এন্তার মদ্যপান করেছে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। সেটাও নিশুতি জানে। এখন কথা হচ্ছে রজত একা বেরিয়েছিল না সঙ্গে কেউ ছিল? তবে কেসটা আত্মহত্যা বোলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে মার্ডার। কারণ পি.এম. রিপোর্ট বলছে, মৃত্যুর আগেই তার সেন্স লস্ট হোয়েছিল। তার ডানদিকের রগে ছিল প্রচণ্ড কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন।

—তা চলন্ত ট্রেনের নীচে ঝাঁপালে সেটা হোতে পারে না?

—চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপালে তার দেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। রজতের দেহ সেভাবে পাওয়া যায়নি। কি শ্যামচাঁদ তুমি তো দেখেছ ওর দেহ?

—হ্যাঁ দাদা। একমাত্র মুণ্ডু আলাদা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর তেমন কিছু চোখে পড়েনি।

—অতএব সব সত্যি বেরোতে পারে নিশুতির মুখ দিয়ে। তাই তার মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রতি পদে। লকাপে আত্মহত্যার ঘটনা তো আজ নতুন নয়।

—তার মানে, শ্যামচাঁদ বলল, দারোগা সত্যশোভনই কি পালের গোদা?

—আর কটা দিন অপেক্ষা কর শ্যামচাঁদ। পালের গোদা ধরা পড়ছেই। আমার পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছেই। দিতেই হবে। দীপু আর স্বপ্নাকে আমি দুটো কাজের ভার দোব।

স্বপ্না জিগ্যেস করল,—হ্যাঁ দাদা বলুন।

—মিতা দাসের ওপর তোমার নজর রাখতে হবে। যে কোন মুহূর্তে ওর কোন বিপদ হোতে পারে। আর দীপু, বিশ্বদীপের আস্তানা তোকে দেখিয়ে দোব। ওর ওপরই একটা শ্যাডো অ্যাডভেঞ্চার করা দরকার। লোকটা গায়ে পড়ে এতো কিছু বলতে এলো কেন? কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আমাকে ডাইভার্ট করার মতলবও হোতে পারে।

—ওক্কে বস্। যা বলছ তাই হবে।

হঠাৎ শ্যামচাঁদ বলল,—তাহলে দাদা, আমি কি করব?

—আপাতত তুমি ঠিকমতো কারখানার কাজে যাবে আর প্রতীক্ষা করবে। একটা কথা মনে রেখো সময় না এলে কিছুই হয় না।

—খুব খারাপ এবং নীরস কাজ। কিন্তু দাদা, যতক্ষণ না খুনি ধরা পড়ে ততক্ষণ তো আপনাকে আমাদের বাড়ি থাকতে হবে।

—মা অন্নপূর্ণা থাকতে দিলে আমার আর চিন্তা কী?

২২

পরদিন সকালে নীলকে একবার কলকাতায় আসতে হল। কাজগুলো হয়তো ওখানেই করা যেতো। কিন্তু কিছু অসুবিধাও ছিল। প্রথমত একটি গোপন চিঠি টাইপ করানো এবং সেটি কুরিয়ারে পাঠানো। চেনা লোক ছাড়া অন্য কোথাও করাতে গেলে নানান রকম কৈফিয়ত দেওয়া। বিশেষ করে লোক জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একই চিঠি দুজনের কাছে পাঠানো হোল। চিঠিটা এই রকম, 'প্রিয় মহাশয়, মৃত ক্ষণপ্রভা নন্দীর একগুচ্ছ পত্র পাওয়া গেছে। সেই

পত্রাবলীর মধ্যে একটি মারাত্মক পত্র আছে যা আপনার পক্ষে শোচনীয় ফলদায়ক হয়ে দাঁড়াবে। ঐ চিঠি প্রমাণ করবে আপনার ধারাবাহিক কুকীর্তি। ক্ষণপ্রভা নন্দী ও রজতশীর্ষ নন্দীকে পরিকল্পিত উপায়ে খুন করা এবং তাদের তহবিল তছরূপ, সবই উল্লিখিত আছে সেই ভয়ানক চিঠিতে। এক্ষেত্রে নিজেকে বাঁচাবার একটাই পথ ওই চিঠিটি স্বহস্তগত করা। চিঠিটির মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা। আরও একটি অপরাধ আপনি সংঘটিত করেছেন। সৃজনমায়ার সদস্যা শ্রীমতী মিতা দাসের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। মহিলা এখন সন্তানসম্ভবা। তাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েও আপনি তা কার্যে রূপান্তরিত করতে চাইছেন না। এটাও সামাজিক অপরাধ। শ্রীমতী দাস আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন। পরিবর্তে তাকে আরও দু লক্ষ টাকা জরিমানা হিসেবে প্রদান করতে হবে। নইলে, আপনিই যে তার সন্তানের জনক, বিজ্ঞানের দৌলতে সেটি প্রমাণ করা তেমন কোন শক্ত কাজ নয়।

অতএব আগামী শনিবার রাত বারোটায় ওই সাত লক্ষ টাকা সমেত শ্রীমতী দাসের ঘরে আসবেন। টাকার বদলে আপনি সব দিক থেকে আপনার মুক্তি কিনতে পারেন। কোন রকম চালাকির আশ্রয় নেওয়াটা আপনার পক্ষে হবে বিপজ্জনক ঝুঁকি। ইতি আপনারই এক শুভার্থী।

জগদ্দলে ফিরে ও প্রথমেই গেল সত্যশোভন মজুমদারের কাছে। সত্যশোভন তখন নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এস. আই. জগৎপ্রিয় এখনও শয্যাশায়ী। ফলে সত্যশোভনবাবুকে সব দিক সামলাতে হচ্ছে। অবশ্য এ.এস.আই. মাল্যবান সেনগুপ্ত যথাযথ সহযোগিতা করে যাচ্ছিল। নীলকে দেখে সত্যশোভন বললেন,—গতকাল আপনার শ্যামচাঁদের বাড়িতে একজন কনস্টেবলকে পাঠিয়েছিলাম। আপনি ছিলেন না?

—না। বিশেষ কাজে একটু কলকাতায় যেতে হয়েছিল। তা নিশুতির খবর কি? আছে? নাকি আত্মহত্যা করেছে?

—হঠাৎ আত্মহত্যার প্রশ্ন?

—আপনাদের আদরের ঠেলায় মাঝে মাঝে কয়েদিরা আত্মহত্যা করে না?

—আজ পর্যন্ত এ থানায় তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি।

—যা যা জানার কথা সেগুলো জেনেছেন?

মাল্যবান পাশেই ছিল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সত্যশোভন জিজ্ঞাসা করলেন,—কি মাল্যবান আমরা কী বিশেষ কিছু জেনেছি?

মাল্যবান মৃদু হেসে বলল,—কত ঘাগু লোক মুখ খুলে দেয় আর এ তো জীবনে প্রথম গারদ দেখলো।

নীল একবার মাল্যবানকে দেখে নিয়ে বলল,—তাহলে নিশুতি সম্বন্ধে আমার অনুমানটা মিলে গেছে বলছেন?

সত্যশোভন বললেন,—টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট। কিন্তু ব্যাপারটা তো আমি এখনও ভেবে উঠতে পারছি না। আন্দাজে এরকম ঢিল ছোঁড়া যায়?

—না, একেবারে আন্দাজে নয়। আসলে একটা মুক্তোই আমার চোখ খুলে দেয়। মুক্তোটা একটা আংটির মুক্তো। ধস্তাধস্তিতে ওটা ছিটকে গিয়েছিল। লোকটার হাতে এখনও আংটির দাগ আছে। আমি দেখে নিয়েছি।

—আপনার চোখের তারিফ না করে পারছি না। তা আপনি যদি বলেন তাহলে নিশুতিকে প্রধান আসামী করে ওর নামে চার্জশীট তৈরি করি। তারপর আদালতে ও সব স্বীকার করবে।

—উঁহু, নিশুতির স্বীকারোক্তি দিয়ে আপনি কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যদি বলি আমি নিজের চোখে দেখেছি আপনি অমুককে খুন করেছেন, আদালত সেটা মেনে নেবে? নাকি আপনার অপরাধ তাতে প্রমাণিত হয়ে যাবে? শুধু আই এভিডেন্স দিয়ে সব সময় সব খুনির বিচার শেষ হয় না।

—হ্যাঁ, সেটা তো আমিও ভেবেছি। বাট প্রমাণটা কই? এমন কি আপনি যে চিঠির কথা বলছেন, সেগুলো পাওয়া গেলেও তো কাজ হোত।

নীল হাসল। তারপর বলল,—চিঠি? মিস্টার মজুমদার, আদপেই কি সে চিঠিগুলো এখনও আছে? নাকি সত্যি সত্যিই সে চিঠি ক্ষণপ্রভা কাউকে দিয়ে গেছে? আসলে সবটাই তো চাল। সবটাই তো আন্দাজে অন্ধকারে লক্ষ্যভেদ করার মতো ব্যাপার। সে যাক, এখন যা যা করার সেটা শুনুন, তার আগে, মাল্যবানবাবু, আপনি কি একবার নিজের চোখে দেখে আসবেন, নিশুতি এখনও বেঁচে আছে কিনা?

—ওহ্ সিওর। আমি এখনই দেখে আসছি। বলেই ইয়াং ছেলেটি দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ওর অনুপস্থিতির সুযোগে অতি সংক্ষেপে দুজনের কাছে ওঁড়ো চিঠি পাঠাবার সংবাদ জানিয়ে নীল বলল,—আসছে শনিবার সন্ধে থেকেই ছদ্মবেশে আপনার লোক মিতা দাসের বাড়ি ঘিরে রাখবে। এটা কিন্তু খুবই গোপনীয়। আর রাত এগারোটা নাগাদ

—আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। শনিবার রাত্রে আমি নিজে থাকব।

—খুনি কিন্তু খুবই সজাগ।

—সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সত্যি কি মিতা দাসের কাছে চিঠি আছে?

—জানি না। একজন তো বলছে ওর কাছেই চিঠির অ্যালবাম রয়েছে। তার আগেই আমি মিতা দাসের সঙ্গে দেখা করে নিচ্ছি। সত্যি মিথ্যে তখনই জেনে যাব।

—কিন্তু মিতা দাসের লাইফের ওপর শনিবারের আগেই তো খুনি অ্যাটেম্পট্ নিতে পারে।

—পারে। তবে আমি যে ছেলেটিকে তার ওপর চোখ রাখতে বলেছি হি ইজ ভেরি মাচ এফিসিয়েন্ট।

ইতিমধ্যে মাল্যবান এসে পড়ল,—বলল, না স্যার, মক্কেল এখন ঘুমচ্ছে।

২৩

ভাদ্রের গোড়া। যখন-তখন বৃষ্টি নামছে। কখনও ঝমঝমিয়ে, কখনও ঝিরঝির করে। বিশ্বদীপ নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখল। সকাল থেকে বায়না ধরা বাচ্চার মতো একনাগাড়ে কেঁদে চলেছে আকাশটা। এখনও পড়ে চলেছে। বিশ্বদীপ ঘড়ি দেখল। রাত সাড়ে বারোটা। একটা উড়ো চিঠি এসেছে ওর কাছে। তার মানে তার ধারণাটা ঠিকই। চিঠিগুলো আছে মিতার কাছে। চিঠিগুলো তাকে যেমন করেই হোক পেতে হবে। কিন্তু চিঠিগুলোর বদলে মিতার দাবি সাত লক্ষ টাকা! বিশ্বদীপ হাসল। মেয়েটা নিজেকে ভাবে কি? সাত লক্ষ টাকা দিতে হবে একটা চিঠি আর একটা প্রেগন্যান্সির জন্যে? বিশ্বদীপ কিছুতেই ভাবতে পারছে না মিতা কিভাবে এতোটা পাল্টে গেল? এতোটা নীচে নেমে গেছে? টাকা রোজগারের এই ধান্দাটা তাকে শেখালো কে? ক্ষণপ্রভা না রজতশীর্ষ? কিন্তু তার এই আস্তানার ঠিকানা তো মিতা জানে না। নাকি কোনভাবে জেনে ফেলেছে। একমাত্র গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি ছাড়া আর কেউ তার এই অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা জানে না। কিন্তু সে ভদ্রলোক তো এই ভাবে টাকা ক্লেইম করে চিঠি দেবে না। তাহলে?

বিশ্বদীপ আবার ঘড়ি দেখল। সবে ত্রিশ মিনিট কেটেছে। রাত বারোটার মধ্যে টাকাটা নিয়ে যাবার কথা। না টাকা সে দেবে না। কিন্তু চিঠিগুলো তার চাই। ওর মধ্যেই আছে মৃত্যুবাণ। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। ভালো মুখে না দিলে—

রেনকোর্টের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে একবার দেখে নিল। তারপর আলো নিভিয়ে দরজায় তালা দিয়ে নীচে নেমে এলো। পাঁচ ভাড়াটের বাড়ি। কোন কেতার ব্যাপার নেই। মেসবাড়ি বলা যায়। তাই নেই কোন ভিজিটিং কাউণ্টার। ছোকরা চাকরটাকে বলাই ছিল। টাকায় কী না হয়? সকালেই ওর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়েছিল। দরজা খোলাই আছে। বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে ও গিয়ে রাস্তায় নামল। কিন্তু ও বুঝতেই পারল না আরও একজন ওর মতোই ওকে নিরাপদ ব্যবধান থেকে অনুসরণ করে চলেছে। সে দীপু।

বৃষ্টি পড়েই চলেছে। এখন ঝিরঝির করে পড়ছে। বিশ্বদীপ সোজা হাঁটা দিল মিতার বাড়ির রাস্তায়। ইচ্ছে করেই সে বারোটার কাঁটা পার করিয়ে যাচ্ছে। এটা যদি মিতার কোন চাল হয় তাহলে সে ধরেই নিয়েছে আজ আর কেউ আসছে না। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই আলোটালো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে।

দ্রুত পা চালালো বিশ্বদীপ। বৃষ্টির মধ্যে এতো রাতে রাস্তায় চলাও সমীচীন নয়। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে তার কোন উপযুক্ত জবাব তার কাছে নেই। ক্ষণপ্রভা আর রজতের মৃত্যুর পর পুলিস আরও সজাগ হয়ে গেছে। গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি তার সব কথা বিশ্বাস করেছে কিনা কে জানে। লোকটাকে সে একটা মিথ্যে কথা বলেছে। চিঠিগুলো মিতার কাছে আছে। থাকতেও পারে। ক্ষণপ্রভা একদিন তাকে বলেছিল চিঠির অ্যালবামটা সে মিতার কাছে রেখে যাবে। কিন্তু এই শুভার্থীটি কে? নাকি এটা মিতার চাল? ব্ল্যাকমেইল করার ধান্দা?

না, মিতা, এ খেলা আমি আজই শেষ করব। রজত আর ক্ষণপ্রভা তাদের পাপের শাস্তি পেয়েছে। ওদের মরতেই হোত। মরেওছে। তারও এখানকার কাজ শেষ। চিঠির অ্যালবামটা হাতে পেলে একটা পার্মানেন্ট রোজগারের রাস্তা খুলে যায়। যেটা আজ মিতা করেছে সেটাই সে করবে। রজত তাকে সর্বশ্রান্ত করে দিয়েছে। শালা শালিকজোড়। একজন দেহের যাদুতে তাকে নিংড়েছে আর একজন প্রোমোটার হওয়ার ধান্দা দেখিয়ে তাকে একেবারে পথে বসিয়েছে। মাঝখান থেকে নেপোয় সব দই মেরে দিয়ে চলে গেল।

পায়ের গতি যতো দ্রুত হচ্ছিল তার ভাবনার গতিও দ্রুততর এগিয়ে চলছিল। মনে পড়ে যাচ্ছিল সেদিনের কথা। ক্ষণপ্রভা আর রজত যেদিন খুন হোল, রজত বলেছিল দুপুর বারোটার মধ্যে ওর বাড়িতে যেতে। একটা নতুন

মুরগি বধের ধান্দায়। লোক ঠকানোর বিদ্যেটা দুজনেই ভালো রপ্ত করেছিল। রজত আর ক্ষণপ্রভা। মেড ফর ইচ-আদার। ব্যাঙ্কের চাকরিটা ছেড়ে দেবার পর পুলিসি ঝামেলা এড়াতে কলকাতা ছেড়ে জগদ্দলে এসে উঠেছিল। কলকাতা থেকে জগদ্দল এমন কিছু দূর নয়। যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়তে পারতো। তাই এখান থেকেও পালাবার ধান্দায় ছিল। কিন্তু ও যা কিছু করেছিল সব অন্য নামে। প্রভাকর দত্ত আর সীমা দত্ত। কোথাও ওদের কোন ছবি নেই। কোথাও কোন পেপারে ওদের সইও নেই। বাইপাশে ফ্ল্যাট কেলেঙ্কারি, সেখানেও সে কেউ নয়। সেখানে প্রভাকর দত্ত আর বি. ঘোষ। এখানে এসেও ধান্দা করেছিল সৃজনমায়াকে নিয়ে। সৃজনমায়ার কালচারাল অ্যাকটিভিটিজকে সামনে রেখে সৃজনমায়া মুভিজ-এর ব্যানারে নতুন টিভি সিরিয়ালের ব্যবসায় নামতে যাচ্ছিল। সিরিয়ালটা লোক দেখানো। ধান্দা মধুচক্র খোলার। সিরিয়ালের মোহে সুন্দরী সব মেয়েরা আসবে। একসময় তারাই হয়ে যাবে মধুচক্রের মধু। আর ছেলেরা যারা আসবে তারা সিরিয়ালে মুখ দেখাবার জন্যে ঢালবে টাকা। সবই ঠিকমতো এগোচ্ছিল। সেদিন দুপুরে মিস্টার রামধুন ভাটিয়ার কাছে যাবার কথা। প্রোডিউসার। নতুন মুরগি। মুরগি বধের প্রাথমিক কাজ শেষ করতে করতে প্রায় বিকেল পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। ভাটিয়ার কাছ থেকে সেদিন হাজার পঞ্চাশেক টাকাও নেওয়া হয়েছিল নতুন অফিস ঘরের জন্যে কিছু অ্যাডভান্স সেলামি।

'হারামজাদা' বলে খানিকটা থুতু ছেটালো বিশ্বদীপ। হারামজাদাটা বলেছিল বাড়ি ফিরে তাকে অন্তত হাজার দশেক টাকা দেবে। কিন্তু ছটা নাগাদ জগদ্দলের ফ্ল্যাটে ফিরে সব হিসেব ওলটপালট হয়ে গেল।

রজতের কাছে ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি থাকতো। ঘর অন্ধকার। দু-তিনবার ক্ষণপ্রভার নাম ধরে ডাকতেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তারপর আলো জ্বালাতেই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য, সেটা মনে পড়তেই বিশ্বদীপ মনে মনে শিউরে উঠল।

দামি কার্পেটের ওপর ক্ষণপ্রভার প্রায় অর্ধনগ্ন শরীরটা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। জিভ বেরিয়ে গেছে। চোখ দুটো বীভৎস আকারে থেমে গেছে। কশের পাশ দিয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে চলেছে। আর গলায় নাইলনের ফাঁসটা চেপে বসে আছে।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল রজতশীর্ষ। সেই মুহূর্তের কথাগুলো এখনও মনে আছে বিশ্বদীপের। ঘটনার আকস্মিকতায় সেও তখন বিহ্বল। এমন একটা

কাণ্ড ঘটবে তেমন কোন ধারণা ছিল না। যদিও কিছুদিন ধরে ক্ষণপ্রভা তাকে বলতো তার নাকি জীবননাশের সম্ভাবনা আছে। কেউ একজন তাকে এক ভয়ানক চিঠি দিয়েছে। তাকে থ্রেট করেছে। বিশ লক্ষ টাকা নগদে তাকে না দিলে শালিকজোড়কে সে খতম করে দেবে। বিশ্বদীপ সে চিঠিটা দেখতেও চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষণপ্রভা দেখায়নি। কেবল বলেছিল চিঠিটা সে মিতার কাছে রেখে যাবে। যদি সত্যিই কোনদিন তার অপঘাত মৃত্যু হয় সেদিন ওই চিঠি পুলিসের কাজে লাগবে। সেই মুহূর্তের রজতের কথাগুলো এখন মনে পড়ছে, রজত মাটিতে বসে পড়ে বলেছিল,—আমার এ সর্বনাশ কে করল বিশু?

উত্তরে সে বলেছিল,—কিছু মনে করিস না রজত, এটাই বোধহয় আমাদের সকলের পরিণতি। অনেক চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। এখনও বলছি রজত আর পাপের মাত্রা বাড়াস না।

উত্তরে রজত কোন কথা না বলে স্থাণুর মতো বসেছিল। একটু পরে বিশ্বদীপ ফোনের কাছে গিয়ে ফোন তুলতেই রজত ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে বলেছিল,—কোথায় ফোন করছিস?

—কেন, থানায়?

—তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুই খুব ভালো করেই জানিস পুলিস আমাদের খুঁজছে। কলকাতা পুলিস জেনে গেছে, প্রভাকর দত্ত আর রজতশীর্ষ নন্দী একই লোক। আমাদের নামে হুলিয়া আছে।

—তাহলে?

—আমায় একটু ভাবতে দে। তুই এখন যা।

চলেই আসছিল বিশ্বদীপ। মনটা খুবই খচ্‌খচ্‌ করছিল। করকরে পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়ে গেছে রজতের ব্যাগে। দশ হাজার টাকা তার পাবার কথা। কিন্তু সেই মুহূর্তে টাকাটা চাইতেও পারছিল না। হঠাৎই সোফায় নজর চলে যায়। দেখে একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ। রজতকে লেখা ছোট্ট দুটো লাইন, "বিশ লক্ষ টাকার দশ লক্ষ তুলে নিলাম তোর বউকে মেরে। আজ রাত ঠিক এগারোটায় বাকি দশ লক্ষ টাকা নিয়ে রেললাইনের ধারে, ওলাইচণ্ডী মন্দিরের বড় ঢিপির কাছে চলে আসবি। নইলে শালিকজোড়ের আর একটা শালিককেও শালিকনীর কাছে পাঠিয়ে দোব। পুলিস-টুলিস করতে যাস না। সুবিধে হবে না।

তবে পুলিসের কাছে যাবার ক্ষমতাও তোর নেই। ধরা পড়ে যাবি আরও বড়ো কেসে। যতোই কেন প্রভাকর দত্ত-র বেনামীতে কাজ করিস। তোকে ফাঁসাবো আমি।"

চিঠিটা রজতের কাছে ফেলে দিয়ে বিশ্বদীপ ফিরে গেছিল। আর ঠিক তার পরদিনই খবর পায় রজত রেললাইনে গলা দিয়েছে। কিন্তু সে এখনও বিশ্বাস করে না রজত সুইসাইড করেছে। তার মনে হয় যে লোকটা ক্ষণপ্রভাকে খুন করেছে, সেই রজতকে খুন করেছে। কারণ রজতকে সে চেনে। রজত তার নিজের থেকেও সম্ভবত টাকাকে বেশি ভালবাসে। টাকা সে নিয়ে যায়নি। কিন্তু একটা সংশয় থেকেই গেছে, অত রাত্রে রজত রেললাইনের ধারে গেলই বা কেন? পকেটে সাড়ে ছ-হাজার টাকা নিয়ে? স্ত্রীর হত্যাকারীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে? তাহলে তো সঙ্গে তার রিভলবারটা থাকার কথা। সেটাই বা গেল কোথায়? রিভলবারের কথা তো কাগজে কিছু লেখেনি!

কখন যে পথ ফুরিয়ে গিয়েছিল, সেটা টের পেল যখন, তখন সে মিতার ঘরের দরজার সামনে। একবার ঘড়িটা দেখল। রাত একটা। টুকটুক করে দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আলতো করে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা খুলে গেল। প্রায় নিঃশব্দে সে ঘরে ঢুকে যায়। ঘর অন্ধকার। কোন রকম ভূমিকা না করে বিশ্বদীপ বলে ওঠে,—ঘরটা অন্ধকার করে রেখেছ কেন মিতা? আলোটা জ্বালো। তোমার মুখটা দেখি। কতটা পিশাচিনীর মতো লাগছে। শেষ পর্যন্ত তোমার যে এতো অধঃপতন হবে ভাবতে পারিনি।

অন্ধকারেই মহিলা কণ্ঠ ভেসে ওঠে,—নাটক না করে আগে বলো টাকাটা এনেছ?

—কিসের টাকা?

—চিঠিতে সব লেখা ছিল। সাত লক্ষ টাকা।

—এ তোমার অবাস্তব বায়না।

—না অবাস্তব নয়। একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ। কত লোকের চোখের জলে তোমাদের টাকার পাহাড় তৈরি হয়েছে।

—তুমি একটা বড় রকমের ভুল করছ মিতা। টাকার পাহাড় তৈরি যে করেছিল সে আজ নেই। হয় খুন হয়েছে, নয়তো আত্মহত্যা করেছে। আর তোমার প্রেগন্যান্সি? তুমি ভালো করেই জান তার জন্যে আমি দায়ী নই। সে যাক, ক্ষণপ্রভা আমায় বলে গেছে যে চিঠিগুলো সে তোমার কাছে রেখে গেছে

তার মধ্যে একটা চিঠিতে আছে খুনির হদিশ। প্লীজ মিতা টাকা **আমার কাছে** নেই। অতো টাকা দেবার ক্ষমতাও আজ আমার নেই। আজ আমি **ওই রজতের** কারসাজিতে প্রায় নিঃস্ব। প্লীজ চিঠি আমায় ফেরত দাও।

—কেন? ক্ষণপ্রভা আমার কাছে তার চিঠি রাখবে কেন?

—কারণ, সম্পর্কে সে তোমার কি রকমের বোন ছিল।

—না। বাজে কথা। ক্ষণপ্রভার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আমি স্বীকার করি না। ভালো কথা ক্ষণপ্রভাদি যখন বলেই গেছে সেই চিঠি আমার কাছে আছে, তখন তো সেটা দাম দিয়েই কিনতে হবে।

—তাহলে তুমি চিঠিটা দেবে না?

—একবার তো বললাম।

—এবার তবে আমায় জোর করতে হবে। তুমি জানো না, ঐ চিঠি না পাওয়া গেলে ক্ষণপ্রভার খুনিকে ধরা যাবে না। প্রমাণও করা যাবে না কোন কিছুই।

হঠাৎ একটা খট্ করে শব্দ হল। দরজা খোলার আওয়াজ। বিশ্বদীপ ঘুরে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করে,—কে? কে ওখানে?

কোন সাড়া নেই। কেবলমাত্র আগন্তুকের সিল্যুট। বিশ্বদীপ চকিতে তার ছোট্ট হাত টর্চটা বার করে আগন্তুকের মুখের ওপর ফেলেই চমকে ওঠে,—একি তুমি? এখানে, এতো রাতে?

আগন্তুক বলে,—ওই একই প্রশ্ন আমি তোমাকেই করছি। এতো রাতে এক পরস্ত্রীর ঘরে তোমার আসার কারণ?

—পরস্ত্রী? ঠোঁট বেঁকায় বিশ্বদীপ, ওর স্বামীটা কে? তুমি?

—সেটা ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

—সত্যি হোলে মিতার মহাদুর্ভাগ্য। আসলে তোমার মতো লম্পট, দুশ্চরিত্র জালিয়াত আর শয়তানকে মিতা কখনই বিয়ে করতে পারে না।

—তুমি একটা কথা ঠিকই বলেছ, বিয়েটিয়ে আমার ধাতে পোষায় না। মিতার স্বামী হবার জন্যেও আমি এখানে আসিনি। যে জন্যে এসেছি, সেটা একটা মামুলি চিঠি। যেটা বর্তমানে মিতার কাছে। এবং একটু পরে যেটা আমার হস্তগত হবে।

—আমার দেহে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকতে সেটা তোমার হাতে পৌঁছবে না।

—পৌঁছবে, পৌঁছবে, কারণ আমার হাতের টিপ অব্যর্থ, না, না বিশ্বদীপ, একেবারেই পকেটে হাত ঢোকাবার চেষ্টা কোর না। এ হাতে অনেক খুনের রক্ত

BanglaBook.org

লেগে আছে। আরও কয়েক ফোঁটা বাড়লে মহাভারত অশুদ্ধ হবেনা। মিতা, চিঠিগুলো দাও।

—না মিতা, চিৎকার করে ওঠে বিশ্বদীপ, আমি জানি না ও তোমার স্বামী কিনা, কিন্তু ও একটা শয়তান, এর আগে দু দুটো খুন ও করেছে। অস্বীকার করতে পার?

আগন্তুক বলে,—এখন এ ঘরে কেউ নেই। আমরা তিনজন ছাড়া। তার মধ্যে তুমি হচ্ছ আমার বাল্যবন্ধু। আর একজনের সঙ্গে আমার অনেক রাত কেটে গেছে। তাই তোমাদের বলতে আপত্তি নেই। আপত্তি না থাকার আরও একটা কারণ, তোমাদের দুজনের কেউই কাল ভোরের আলো দেখতে পাচ্ছ না। হ্যাঁ শোন, শালিকজোড়কে আমিই খুন করেছি। ক্ষণপ্রভার মতো দুশ্চরিত্রা নারীর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। আমার প্রথম যৌবনটাকে, প্রথম ভালাবাসার স্বপ্নকে ও জুতোর ডগায় মাড়িয়ে ওর মাসতুতো ভাইকে বিয়ে করেছিল। এবং আমায়, আমার দুর্দিনে এক লক্ষ টাকার দেনায় ফেলে দিয়েছিল। আমি তা ভুলিনি। পরাজয়ের গ্লানি আমি কোনদিন মেনে নিইনি। তখন আমাদের মনে বড়লোক হবার স্বপ্ন ছিল। তুমি জান ধার করে, বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ভেঙে, বোনের বিয়েকে নস্যাৎ করে নগদ এক লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলাম রজতশীর্ষ নন্দীর হাতে। তোমারও নিশ্চয়ই মনে আছে সেদিনের সেই এক লক্ষ টাকার কথা। তুমিও দিয়েছিলে। কিন্তু আমার মতো নিঃস্ব হয়ে নয়। তুমি ভুলেছ। আমি ভুলিনি। তাই আবার যখন ওদের আবিষ্কার করি, পুরনো জ্বালা গরলের মতো আমার শরীর জ্বালিয়েছে। আমার দাবী ছিল বিশ লক্ষ টাকা। আর ক্ষণপ্রভার ছলনাময়ী দেহ। আমি দেখতে চেয়েছিলাম কোন্ শারীরী অহংকারে সে আমার মতো সুপুরুষকেও অবহেলা করে। আমি এক এক করে তার শরীরের সব অহমিকাকে চূর্ণ করে তার গলায় আমার শেষ প্রেমের ফাঁস লাগিয়ে দিয়েছি। বাঁচতে দিইনি রজতকেও। তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম রেললাইনে ধারে ওলাইচণ্ডীর মাঠে। তারপর একটা ভারী লোহার ডাণ্ডায় তার রগ ফাটিয়ে দিয়ে তাকে নিশ্চিন্তে রেললাইনের শুইয়ে দিয়ে এসেছিলাম।

আগন্তুক থামতেই মিতা জিগ্যেস করল, —আর ওদের গুপ্ত সিন্দুকের টাকাগুলো?

—কার টাকা? ওদের? না। অনেক মানুষের দীর্ঘশ্বাসের টাকা। ওটাও আমি নিয়েছি। সুযোগ ছিল। নিয়েছি। না হলে বিশ্বদীপের মতো অবস্থা হোত।

এনিওয়ে, মিতা, আমার চিঠিটা দাও। আমি ধরা পড়তে চাই না। কোন ভাবেই খুনের আসামী হবার ইচ্ছে নেই। জেনে রেখো আমি যা করেছি সেটাই ছিল তাদের পাওনা। চিঠিটা দাও মিতা। নইলে তোমাকেও মাটিতে শুইয়ে দিতে আমার আঙুল কাঁপবে না। দাও, আমার হাতে আর সময় নেই।

—কিন্তু তোমার দেওয়া সন্তান, যেটা এখনই জানান দিচ্ছে সে বেঁচে আছে।

—সন্তান? এমন তো কোন কথা ছিল না, তোমার দেহের বদলে তোমার দেহের পাপটাকেও আমাকে নিতে হবে? ওটাকে অ্যাবরশন করিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। সব পাপ ধুয়ে যেতো।

—কিন্তু সেটা যে কখনও ধুয়ে যায় না এস. আই. জগৎপ্রিয় কর।

চমকে পেছনে ফেরে জগৎপ্রিয়। দেখে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে পুলিস অফিসার সত্যশোভন, গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি, এ. এস. আই. মাল্যবান আর গোটা চারেক কনস্টেবল। কখন যে তারা ঘরে ঢুকে পড়েছে সেটা জগৎপ্রিয় খেয়াল করতেই পারেনি। আর ঠিক তার পেছনে দীপু।

জগৎপ্রিয় হয়তো ট্রিগারে আঙুল রাখতে যাচ্ছিল। ততক্ষণে সারা ঘর আলোকিত হয়ে গেছে। তারই মধ্যে নীল বলে উঠল,—ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াবেন না জগৎপ্রিয়, সবাই বলে আমার হাতে বাঘমারা টিপ। আপনার আঙুলটাই উড়ে যাবে। আপনার খেল খতম মিস্টার কর।

সত্যশোভন সাহসে ভর করে এগিয়ে আসেন জগৎপ্রিয়র সামনে,—আমাকে গুলি করে তোমার কোন লাভ হবে না। উল্টে তোমার বিরুদ্ধে আর একটা খুনের চার্জ বাড়বে। দাও রিভলবারটা আমায় ফেরত দাও।

সামান্য পিছিয়ে জগৎপ্রিয় একেবারে দেওয়ালে পিঠ রেখে বলে,—না স্যার, আপনাকে আমি মারব না। আপনাদের কাউকেই আমি মারব না। আপনাদের কারো ওপর আমার কোন ক্ষোভ নেই। যারা আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছিল আমি তাদের বদলা নিয়েছি। পৃথিবী থেকে আমি দুটো জঞ্জাল সরিয়ে দিয়েছি। আমার কোন অনুশোচনা নেই। তবে আপনারাও আমাকে জীবিত ধরতে পারবেন না। একটু আগে মিস্টার ব্যানার্জি বলছিলেন ওনার হাতে বাঘমারা টিপ। আমার হাসি পেয়েছিল, উনি জানেন না চোখের পলকে আমি উড়ন্ত চড়ুইকেও গুলি করে মারতে পারি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে জগৎপ্রিয় নিজের পিস্তলটা নিজের রগে ঠেকিয়ে ফেলেছে,—না, আর আপনাদের কারো কিছু করার নেই। কেবল বিশ্বদীপ আর

মিতাকে আমার কিছু বলার আছে। বিশ্বদীপ, আমার মতো তুমিও ঠকেছ। তুমিও ক্ষণপ্রভার মায়ায় ডুবেছিলে। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার সাহস তোমার নেই। পার তো, আবার নতুন করে সৎপথে বাঁচার চেষ্টা কোর। আর, মিতাকে আমি ভাল না বাসলেও, ভালবাসার খেলা চালিয়েছিলাম। বোকা মেয়ে বুঝতে পারেনি। আসলে মক্ষীরানীর বোনকে বলাৎকার করে আমি প্রতিশোধের আর এক নতুন স্বাদ পেয়েছিলাম। মিতা, আমায় ক্ষমা কোর। আমি আরও একটা কথা জানি, বিশ্বদীপ আমাদের মতো এতোটা খারাপ নয়। তোমার প্রতি ওর দুর্বলতা আছে। যদি বিশ্বদীপ তোমায় গ্রহণ করে ওকে ফিরিয়ে দিওনা। আমার জিনে তৈরি যে অবয়ব তোমার দেহে বাড়ছে সেটাকেও বাঁচিয়ে রেখো না। কারণ সে তো জগৎপ্রিয়র রক্তে তৈরি। কে জানে বড় হয়ে আবার যদি কোন জগৎপ্রিয় তৈরি হয়। আর একটা কথা, মিস্টার মজুমদার, কুপথে আসা দশ লক্ষ টাকা আর অনেক সোনাদানা, কোয়ার্টারে আমার বিছানা ঘাঁটলে পেয়ে যাবেন। চেষ্টা করলে ওগুলোর কিছু হদিশ পাবেন। যাদের টাকা তাদের ফেরত দেবেন। আর যা বাঁচবে কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেবেন। নিশুতির জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, ল উইল টেক ইটস্ ওন ওয়ে। খুনিকে সাহায্য করলে শাস্তি তো পেতেই হবে। এবং তার জন্যে অনেক টাকাও আমি দিয়েছি। গুড নাইট টু এভরিবডি। তারপরই একটি 'কড়াৎ' শব্দ। জগৎপ্রিয়র ব্যায়াম করা সুগঠিত দেহটা 'আঃ' শব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নীল সেখানে ছুটে গেল। নাহ্, ততক্ষণে সব শেষ।

২৩

—নীলদা, আমার কিন্তু দু'একটা খট্‌কা আছে, দীপু বেশ বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাতে দোলাতে বলল। কথা হচ্ছিল শ্যামচাঁদের ঘরে বসে। রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। জগৎপ্রিয়র মৃতদেহটা নিয়ে চলে যাবার পর বিশ্বদীপকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে। মিতাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সৃজনমায়ার সেক্রেটারির বাসায়। স্বপ্না আর শ্যামচাঁদ রাত্রে ঘুমোয়নি। ওরা জানতো নীলের অভিযানের কথা। নীল আর দীপু ফিরে আসার পর চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে, তারপরে নীলকে ঘিরে তিনজন জমিয়ে বসেছে। শ্যামচাঁদের আজ আর প্রাতঃভ্রমণের তাগিদ নেই।

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নীল বলল,—একটা কেন, দশটা প্রশ্ন করবে। বল তোমাদের কার কি জানার আছে?

আগের কথার রেশ টেনে দীপু জিগ্যেস করল,—জগৎপ্রিয় পুলিসের লোক। ওকে তুমি সন্দেহ করলে কিভাবে? মানে ওর কথাটা তোমার মনে এলো কি ভাবে?

নীল সামান্য হাসলো, তারপর বলল,—তোর কথার মধ্যেই তোর প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে। এই যে একটু আগে বললি, জগৎপ্রিয় পুলিসের লোক। তোর মনে আছে রজতশীর্ষর বাবা, নীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে বাইরে বেরিয়ে এসে তোকে একটা কথা বলেছিলাম—

—হ্যাঁ মনে আছে, তুমি বলেছিলে অনেক সাধারণ কথার মধ্যে আচম্‌কা একটা কথা বেরিয়ে আসে যেটা অসাধারণ। সেটাকে ঠিকমতো ধরে নিতে পারলে রহস্যের অনেক কিছু সরলীকৃত হোয়ে যায়।

—ইয়েস, নীল বলল, মনে করে দেখ, নীরেনবাবু কথার মধ্যেই বলেছিলেন, ক্ষণপ্রভা রজতকে বিয়ে করার আগে একটি ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর বাবা মায়ের মত ছিল না। কেন?

দীপু সোল্লাসে বলে উঠল,—আই সি, হ্যাঁ উনি বলেছিলেন ছেলেটি পুলিসের সামান্য চাকরি করে।

—ইয়েস। এবং পরবর্তী কালে স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সঞ্জয় দত্ত বিশ্বদীপ ঘোষের, নট বি. ঘোষ, চেহারার যা ডেসক্রিপশন দিয়েছিলেন, যদি মনে থাকে মিলিয়ে দেখ, জগৎপ্রিয়র সঙ্গে মিলে যাবে। আর সেটায় কনফার্মড্ হই দুটো ব্যাপারে। প্রথমটা হোল, জগৎপ্রিয়র ডান হাতের তর্জনীটা তুই সম্ভবত লক্ষ্য করিসনি। করা উচিত ছিল। অনেকদিন আঙুলে কোন আংটি পরে থাকবার পর সেটা খুলে ফেললে আংটি পরার একটা দাগ থেকে যায়। এবং থাকেও বেশ কিছুদিন। জগৎপ্রিয়র তর্জনীতে আমি সেই দাগ দেখেছি।

—আর দ্বিতীয়টা?

—প্রথমদিন আমরা ক্ষণপ্রভার ঘরে গিয়ে অনেক টাকা আর গয়নার হদিশ পাই। তারপর ফের যখন আমরা যাই দেখি সব উধাও। এখন বল তো, পুলিস ছাড়া আর কারো পক্ষে কি সম্ভব সেই তালা খুলে ওদের ঘরে ঢুকে ধনসম্পদ লুঠ করা? বাইরের কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। একমাত্র সম্ভব সশস্ত্র ডাকাতি করা। কিন্তু একটা ফ্ল্যাট বাড়ির, বিশেষ একটা ঘরে, যেখানে পুলিসের তালা ঝুলছে, সেই ঘর থেকে ডাকাতি করতে গেলে আবাসনের সব লোকই টের

BanglaBook.org

পাবে। বাধা হয়তো কেউ দিতে পারবে না বা দেবেও না। কিন্তু গোপনীয়তা থাকবে না। ডু ইউ এগ্রি?

স্বপ্না বলল,—ইউ আর কারেক্ট নীলাঞ্জনদা। কিন্তু এসব করতে গেলে তো নিশুতির সাহায্য দরকার।

—অফকোর্স। জগৎপ্রিয় তার পুলিসি উর্দির সুযোগ নিয়ে নিশুতিকে হাত করে ফেলে। কিছুটা ভয় আর কিছুটা টাকার লোভ। পুলিসের ঠ্যাঙানিতে নিশুতি সবই স্বীকার করেছে। ও জানতো ক্ষণপ্রভা কখন খুন হয়েছে। ও জানতো সেদিন আটটার পর ছদ্মবেশী জগৎপ্রিয়র সঙ্গে বেরিয়ে রজত রেললাইনের দিকে গিয়েছিল। এনি মোর কোশ্চেন?

—আর জগৎপ্রিয়র হার্ট অ্যাটাক? সেটা কী?

—অসুখটা ফল্‌স্। ওটা অ্যালিবাই তৈরির চেষ্টা। যদি আমরা ঠিক সময় না যেতাম, ও দুটোকেই খুন কোরে থানায় ফিরে এসে অসুস্থতার দোহাই পেড়ে শুয়ে থাকতো।

দীপু বলল,—আর একটা প্রশ্ন, যত মিনিই হোক, একটা ক্যামেরা, পুলিসের নজরে পড়ল না কেন?

—প্রশ্নটার উত্তর বোধহয় আর পাওয়া যাবে না। যে তিনজন এর উত্তর দিতে পারতো, তাদের কেউই আজ আর বেঁচে নেই। তবে একটা কথা, যেটা আমার অ্যাসামশন, ক্যামেরাটাকে পুলিস তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কারণ সিজার লিস্টে ক্যামেরার কোন উল্লেখ নেই। অথবা এমন হোতে পারে জগৎপ্রিয় জানতো ক্যামেরায় বিশ্বদীপের ছবি আছে, ওকে ফাঁসাবার জন্যে ইচ্ছে করে ফেলে গেছিল। নাহ্ ঠিক কী হয়েছিল, এই মুহূর্তে বলা যাবে না।

শ্যামচাঁদ অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল। নীলের কথা শেষ হবার পর সামান্য নীরবতার অবকাশে ও বলে ফেলল,—আমি তো দাদা আগেই বলেছি, সর্ষের মধ্যেই ভূত। আজকের সমাজে যত অপকাণ্ডের ঢেঁকি হচ্ছে ওই পুলিস। ওরা পারে না এমন কাজ ভূ-ভারতে নেই। দেশের হাল দেখে বুঝতে পারছেন না?

—তুমি থাম তো, সিরিয়াস কথার মধ্যে কেবল তোমার নিজের মত ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা; আচ্ছা দাদা, সবই তো হোল, তিনজন অপরাধীই যে যার মতো শাস্তি পেলো, কিন্তু মিতা? মিতার কি হবে? ও তো ভীষণ অবস্থায় পড়ে গেল। সেদিন আমার কাছে এসে খুব কান্নাকাটিও করেছে।

সিগারেটে টান দিতে দিতে নীল বলল,—যদিও পুলিস বিশ্বদীপকে অ্যারেস্ট করেছে। কিন্তু আমি জানি পাকেচক্রে বিশ্বদীপ ওই দলে পড়ে গিয়েছিল। আর রজতের পাল্লায় পড়ে সেও অনেক টাকা গচ্চা দিয়েছে। রজত খুন না হোলে রজতই হয়তো বিশ্বদীপকে সরিয়ে দিতো। কারণ বিশ্বদীপ ওদের পক্ষে এ-লাশ খুবই বিপজ্জনক হোয়ে উঠছিল।

—তাই কি ক্ষণপ্রভা বিশ্বদীপকে আস্কারা দিতো, দীপু জিগ্যেস করল।

—সম্ভবত সেটাই হবে। আমার যতদূর মনে হয় রজত ছাড়া ক্ষণপ্রভা যাদের সঙ্গে মেলামেশা করতো, বা প্রশ্রয় দিতো সবই লোকদেখানো। রজতকে বোধহয় ও সিরিয়াসলি ভালোবাসতো। ওদের শালিকজোড় নামটা খুব একটা বেমানান নয়।

—কিন্তু, স্বপ্না জিগ্যেস করল, জগৎপ্রিয়কে ও এণ্টারটেইন করতো কেন? ভয়ে? না ভালোবাসায়?

—দূর। জগৎপ্রিয়কে ও কোনদিনও ভালোবাসেনি। আমার কাছে এখনও বিস্ময় প্রথম যৌবনে ও কেন জগৎপ্রিয়কে বিয়ে করার জন্যে পরিবারে হুলু স্থুলু ফেলে দিয়েছিল? সেই পুরনো প্রবাদ, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম, বোঝা ভার।

স্বপ্নাকে ইঙ্গিত করে ফুট কাটলো শ্যামচাঁদ,—শোনো, শুনে নাও. দাদা কি বলছেন।

—দাদা, আপনার এই ভাইটাকে বলে দিন তো, স্বপ্না যদি না থাকতো ও অ্যাদ্দিন কোথায় থাকতো। স্ত্রীচরিত্রের ও কি বোঝে?

—এই রে, তোমরা কি এখন দাম্পত্যকলহ আরম্ভ করবে? তাহলে নয় আমরা উঠি।

—না দাদা, স্বপ্নাই উত্তর দেয়, দাম্পত্যকলহেরও একটা রীতি আছে, সেটাও আপনার ভাই বোঝে না, সে যাক, উঠি বলছেন কেন, আজ রবিবার, একেবারে খাওয়াদাওয়া সেরে দুপুরের গাড়িতে ফিরবেন। আবার কবে দেখা হবে কে জানে! না বললে চলবে না।

নীল দীপুর দিকে তাকায়। দীপু বলল,—তাকাচ্ছ কি? এসব ব্যাপারে আমাকে কখনও না বলতে শুনেছো। বউঠান, তুমি, মোরগা নয়, প্লেন ভাত আর খাসির মাংস।

স্বপ্না হেসে ফেলে, বলে,—রাম পেটুকদাস। আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তাই হবে। শ্যাম বাজারে যাও।

—কিন্তু, নীল বেশ আদেশের সুরেই বলে, মাংসের খরচ আমার। একেবারেই না বলা চলবে না।

—অতিথির কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাকেই ভূরিভোজ করানোর রেওয়াজ, স্বপ্না, তোমার কি মনে হয় দাদা ঠিক বলছেন, শ্যাম যেন উসখুসিয়ে ওঠে।

—না, রেওয়াজ-টেওয়াজের কথা নয়, আমি বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তোমাদের খাওয়াচ্ছি, ব্যস আর কোন কথা নয়।

নীল টাকা বার করছে, তখনই স্বপ্না বলল,—দাদা, বিশ্বদীপ কি মিতাকে মেনে নেবে? বা মিতাও কি বিশ্বদীপকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে?

—মনে হয় না বিশ্বদীপের দিক থেকে কোন আপত্তি আসবে। কারণ ওর সঙ্গে আমার একদিনই কথাবার্তা হয়েছিল। মনে হয় না ছেলেটা খুব হৃদয়হীন। দেখা যাক। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। আর মিতার রাজি হওয়া উচিত। মেয়েদের একটা অবলম্বন দরকার। তবে আমার ওই একটাই কথা। সময়। সময় না এলে কিছুই হয় না। আর সময় যে সর্বতাপহরা। টাইম ইজ দ্য বেস্ট হীলার। মিতাও একদিন হাসবে। দুঃস্বপ্নের এই দিনগুলো একদিন ভুলে যাবেই।

পরম দার্শনিকের ভঙ্গীতে দীপু বলল,—হ্যাঁ, নীলদার এই কথাটা আমি হাড়ে হাড়ে জানি, সময়—সময় না হলে কিছুই হয় না। আহারে, বেচারি নন্দিনীদি...

—০—